প্রথম প্রকাশক : ১৩৬৭

প্রকাশক :
মৈনাক ঘোষাল, প্রমীলা প্রকাশনী

মুদ্রাকর :
নিউ কমলা প্রেস,
শ্রীকৃষ্ণমোহন ঘোষ
৫৭/২ কেশব সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

আদি পর্বের সভ্য মানবদের

ওলিম্পিক খেলা ও ম্যারাথন দৌড়

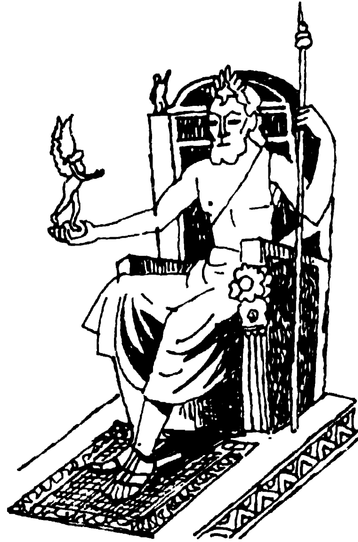
খেলা একদিকে যেমন অবসর বিনোদনের আদর্শ উপকরণ, অপরদিকে তেমনই শরীরকে সুস্থ ও সুন্দর রাখার একটা বড় হাতিয়ার। প্রতিযোগিতামূলক খেলায় জয় পরাজয় আছে, জয়ের একটা সাময়িক উন্মাদনাও আছে, কিন্তু মাঠ ছাড়ার পরে পরাজয়ের গ্লানি বহন করতে হয় না। খেলার প্রতিযোগিতা তাই এক নির্দোষ প্রতিযোগিতা এবং খেলার মাধ্যমেই মানুষ তথা জাতির পরিচিতি বিস্তার লাভ করে। এই সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল বহু প্রাচীনকালে।

এমন একদিন ছিল, যেদিন মানুষের অবসর বিনোদনের কোন মাধ্যম ছিল না। অরণ্যবাসের সময় এবং গুহাবাসের সময় এমন চিন্তা মানুষ পোষণও করেনি বলা চলে। কেননা সে সময়ে চারদিকে শত্রু ওৎ পেতে বসে থাকতো। একটুখানি অন্যমনস্ক হলেই মৃত্যু ছিল অবধারিত। অতি সন্তর্পণে এবং অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তাদের ঘুরে বেড়াতে হতো। গুহাবাসের সময় তারা মুখে রঙীন মাটি মেখে হরিণের মুখোস পরে এবং গায়ে পশুর চামড়া জড়িয়ে শিকারে যাওয়ার আগে শিকার শিকার খেলতো। প্রকৃতপক্ষে সেটি তাদের প্রকৃত খেলা ছিল না। শিকারে বার হওয়ার আগে শিকারের মহড়া। তারা বিশ্বাস করতো, মহড়া না দিলে শিকার জোটে না। যাইহোক না কেন, খেলার আনন্দের স্বাদ সেই প্রথম তারা উপলব্ধি করেছিল।

মানুষ যখন কৃষিকাজে আত্মনিয়োগ করেছিল তখনও তাদের মাথায় খেলাধূলার চিন্তা স্থান পায়নি। সারাদিন অক্লান্তভাবে শ্রম করতে হতো তাদের। বন থেকে কাঠ কেটে বয়ে আনা, কৃষি যন্ত্রপাতি থেকে হাতিয়ার তৈরির জন্য পাথর বহে আনা এবং পাথরকে চাঁচা ছোলা, তার উপর কৃষিকাজ-জলসেচ প্রভৃতি কত কী! তবু নতুন ফসল উঠলে তারা একটু আমোদ প্রমোদ করতো বলে মনে হয়।

নগর সভ্যতার পত্তন হলে কেবলমাত্র কয়েকটি খেলার প্রবর্তন হয়েছিল। কুস্তি বা মল্লযুদ্ধ, লাঠি চালনা ও তীর নিক্ষেপ ছিল তাদের অন্যতম। এই খেলাগুলির প্রবর্তনের পেছনে ব্যবহারিক একটা দিকও ছিল। অর্থাৎ দেশের প্রয়োজনের তাগিদ। নিছক আনন্দ দানের উপকরণ হিসেবে নয়।

আনন্দদানের জন্য খেলার প্রবর্তক গ্রীকরাই। তাঁরাই প্রথম জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে গ্রীকদের কাছ থেকেই প্রতিযোগিতামূলক খেলা অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং কিছু কিছু চিন্তাবিদের চিন্তায় নতুন নতুন খেলা উদ্ভাবিত হয়। অতএব সব খেলার উৎসের মূলে আছে গ্রীকদের অবদান। তাঁরাই নানাবিধ খেলার মাধ্যমে জাতীয় উৎসব পালন করতেন। জাতীয় উৎসব পালন হতো পেলোপন্‌সসের এলিস প্রদেশের ওলিম্পিয়া উপত্যকায় তাঁদের প্রধান দেবতা জীউসের মন্দির-সংলগ্ন প্রান্তরে তথা ওলিম্পিয়ার মাঠে। আরম্ভ হয়েছিল সম্ভবত খ্রীস্টজন্মের ৭৬০ বছর আগে। প্রথম প্রথম ঐ মাঠে কেবল দৌড় প্রতিযোগিতা হতো। কথিত আছে, পেলোপস এবং ওইনোমাস নামে দুই ব্যক্তি প্রথম দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ঐ দৌড় প্রতিযোগিতার প্রবর্তন করেছিলেন গ্রীকবীর হেরাক্লেস।



প্রথম প্রথম দৌড় প্রতিযোগিতাকে পরিচালনা করতেন পিসা শহরের অধিবাসিবৃন্দ। তারপরে পরিচালনার ক্ষেত্রে এথেন্সও যোগদান করে। সেই থেকে ওলিম্পিক ক্রীড়া জাতীয় উৎসবের রূপ নেয়। কথিত আছে, পিসা ও এথেন্সের আটজন করে মোট ষোলজন সুন্দরী বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদানের জন্য পোশাক তৈরি করতেন। সেই পোশাকের প্রধান উপকরণ ছিল মাথার মুকুট। উৎসব হতো প্রতি চার বছর অন্তর। লাতিন ওলিম্পিয়া শব্দের অর্থও তাই। অর্থাৎ "চার বছরের ব্যবধান"। তাই প্রতি চার বছর অন্তর অন্তর উৎসব চলে আসছিল দীর্ঘকাল—৩৯৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত।

তারপর রোমসম্রাট থিওদোসিত্‌স এর আজ্ঞায় উৎসবটি তথা ওলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে যায়।

শুধু দৌড় প্রতিযোগিতা নয়, পরের দিকে অন্যান্য খেলাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তাদের মধ্যে লম্ফন, কুস্তি, বর্শা নিক্ষেপ, লোহার চাকতি নিক্ষেপ ইত্যাদি প্রধান। প্রধান দর্শনীয় খেলা ছিল রথচালনা এবং বিপজ্জনক খেলা ছিল ষাঁড়ের লড়াই। খেলোয়াড়রা তরবারির আঘাতে আঘাতে ষাঁড়কে ক্ষেপিয়ে দিতেন। অমনি ক্ষ্যাপা ষাঁড় শিং তুলে তীব্রভাবে আক্রমণ করতো। কখনও ষাঁড় মারা পড়তো আবার কখনও বা খেলোয়াড়।

প্রথম প্রথম উৎসব ছিল মাত্র একদিনের। পরে দিনসংখ্যা বাড়িয়ে সাত করা হয়। বেশ উপভোগ্য হতো ওলিম্পিক খেলা। স্থানটিও ছিল ভারি রমনীয় এবং জীউসের মন্দিরও ছিল দর্শনীয়। যাট ফুট উচ্চ মন্দিরের অভ্যন্তরে স্থাপন করা হয়েছিল গজদন্ত ও সুবর্ণ নির্মিত জীউসের প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু বিশাল মূর্তি। ওলিম্পিক খেলায় মেয়েরাও অংশগ্রহণ করতে পারতেন। তবে সবার অধিকার ছিল না। একমাত্র দেবদাসীরাই যোগ্য বিবেচিত হতেন।

৩৯৩ খ্রীস্টাব্দের পর আর ওলিম্পিক প্রতিযোগিতা হয়নি। খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রবল এক ভূকম্পনে ও জলোচ্ছ্বাসে ওলিম্পিকের মাঠটাই বসে যায় এবং ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ধ্বংসস্তূপটি ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে একদল জার্মান প্রত্নতাত্ত্বিক আবিস্কার করেন। খননকার্যের ফলে পাওয়া যায় নানা ধরনের খেলার সামগ্রী। তখনই ওলিম্পিক প্রতিযোগিতা পুনঃপ্রবর্তনের চিন্তা কারও কারও মাথায় আসে। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন পিয়েরদ্য কুবেয়ারত্যাঁ। ফ্রান্সের অন্যতম এক শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ। একরকম তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে ওলিম্পিক প্রতিযোগিতা পুনরায় শুরু হয়। সে বছর মাত্র ১৪টি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল। ধীরে ধীরে পৃথিবীর অপরাপর দেশসমূহও যোগদান শুরু করে। তখনই ধরা পড়ে ওলিম্পিকের গুরুত্ব। ধীরে ধীরে পৃথিবীর সব দেশের মধ্যে মৈত্রী ও সৌভ্রাত্রিত্বের মনোভাবও গড়ে উঠে এবং ঐ কারণে ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে কুবেয়ারত্যাঁকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

এখনও চলে আসছে ওলিম্পিক প্রতিযোগিতা এবং পূর্বের ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রতি চার বছর অন্তরই অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম হয়েছিল গ্রীসের সেই এথেন্সে। তারপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে পৃথিবীময়। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে বসে ওলিম্পিকের আসর।

সেই গ্রীকদের আমলেই ওলিম্পিক এক বড় রকমের দৌড় প্রতিযোগিতা যুক্ত হয়েছিল। নাম ম্যারাথন রেস। ম্যারাথন রেসের পেছনে একটা ঘটনা আছে।

৪৯০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে এথেন্সের সঙ্গে তৎকালীন পারস্যের (বর্তমানে ইরান) এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্রটি ছিল গ্রীসের ম্যারাথন নামে একটি জায়গায়।

এথেন্সের সৈন্যবাহিনীর প্রচণ্ড বিক্রমে পারস্যকে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করতে হয়। যুদ্ধের ফলাফল জানার জন্য এথেন্সবাসীরা ছিলেন ভয়ানক উদ্‌গ্রীব। তাঁদের কাছে জয়ের সংবাদটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য এক তরুণ সৈনিক ছুটে যান এথেন্সে। নাম তাঁর ফাইডিপাইডিস।

ম্যারাথন থেকে এথেন্সের দূরত্ব ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ। ঐ দীর্ঘপথ দৌড়াতে দৌড়াতে অতিক্রম করেছিলেন ফাইডিপাইডিস এবং সুখবরটা পরিবেশন করেছিলেন। ঐ ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ওলিম্পিকে ঐ ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ পথ দৌড়াবার প্রতিযোগিতা অন্তর্ভুক্ত হয়। নাম হয় ম্যারাথন রেস। নামটা মনে হয় সবদেশের মানুষেরই জানা।

কুস্তি এবং বক্সিং

কুস্তি খেলাকে আমরা মল্লযুদ্ধ বলি। এই খেলায় দুজন বলশালী ও ব্যায়ামবিদ অংশগ্রহণ করে থাকেন। শুরু হয়েছিল অতি প্রাচীনকালে। অনেকে কুস্তিকে আদিম খেলাও বলতে চান। তাই এর যে শুরু কবে হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলার কোন উপায় নেই। ইতিহাস নীরব এখানে। তবে প্রাচীনকালে কুস্তিবীরদের নিয়ে যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হতো তার নমুনা কিন্তু পাওয়া গেছে।



বিশেষজ্ঞদের ধারণা, খ্রীস্টজন্মের প্রায় ৩০০০ বছর আগেও মিশরীয় রাজা এবং রাজপুরুষদের উপভোগ্য খেলা ছিল কুস্তি। কতকগুলো নমুনাও পাওয়া গেছে। সে

নমুনা বিভিন্ন সময়ে আঁকা কয়েকটা চিত্র। সবচেয়ে পুরনো বলে যে চিত্রটিকে দাবি করা হয়েছে সেটি খ্রীস্টপূর্ব ২০০০ অব্দের দিকে আঁকা হয়েছিল বলে বিশ্বাস। রাজা-রানীর সামনে দুজন মল্লবীর। মিশরের নীলনদের কাছে বেনি হাসান-এর সমাধি মন্দিরের গাত্রে কুস্তি প্রদর্শনের নানা ভঙ্গির মূর্তি খোদিত হয়েছিল। অনেক মূর্তি এখনও আছে। কিছু ভগ্ন, কিছু জীর্ণ।

কুস্তিকে বিজ্ঞানসম্মত এবং শরীরচর্চার উন্নত মাধ্যমরূপে গ্রহণ করেছিলেন সেকালের গ্রীক পণ্ডিতেরা। তাই মিশরীয়দের মত তাঁরাও কুস্তি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং পরে ওলিম্পিক প্রতিযোগিতায় স্থান দিয়েছিলেন। গ্রীক কুস্তিবীররা গায়ে তেল মালিশ করতেন এবং তেলে প্রয়োগ করতেন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বালুকণা। সেকালে গ্রীসের একজন কুস্তিবীরেরর নামও পাওয়া যায়। তিনি ক্রোটনের বাসিন্দা ছিলেন এবং নাম ছিল "মাইলো"। মাইলো ৩২টি মল্লযুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন। ওলিম্পিকে জয়লাভ করেছিলেন ৬ বার।

গ্রীকদের পরে ইওরোপে রোমান আমলে কুস্তি আরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কিছু উন্নতিসাধনও তাঁরা করেছিলেন। পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজা এবং অভিজাতেরা। ওঁরা ছিলেনঅত্যন্ত বিলাসী ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির। সাধারণ মানুষের প্রতি কোন দয়ামায়া ছিল না। অধিকাংশ অভিজাত ক্রীতদাস রাখতেন এবং ক্রীতদাসদের নানা ধরনের নিষ্ঠুর খেলায় নিয়োগ করতেন। তাদের মধ্যে একটি ছিল হিংস্র পশুর সঙ্গে যুদ্ধ। বন থেকে বাঘ সিংহকে ধরে এনে খাঁচায় পুরে রাখা হতো। খেতে দেওয়া হতো না। তারপর ঐ খাঁচায় ঢুকিয়ে দেওয়া হতো একজন ক্রীতদাসকে। সে যুদ্ধ করতো। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্রীতদাস হিংস্র জন্তুটার ভক্ষ্য হতো। এণ্ড্রোক্লিসের কথা কেনা জানেন? মালিকের কঠিন শাসন সহ্য করতে না পেরে তিনি বনে পালিয়ে গিয়েছিলেন। বনে একদিন এক সিংহকে যন্ত্রণায় কাতরাতে দেখে তিনি ভয়ঙ্কর সেই সিংহটার সামনে উপস্থিত হন। দেখেন, সিংহের থাবায় মস্তবড় একটা কাঁটা ফুটে আছে। পরমযত্নে তিনি কাঁটাটা বার করে দিয়েছিলেন। কিছুকাল পরে এণ্ড্রোক্লিস ধরা পড়েন এবং সিংহটাকেও খাঁচায় বন্দী করা হয়েছিল। শাস্তি স্বরূপ এণ্ড্রোক্লিসকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল অভুক্ত সেই সিংহের খাঁচার ভেতরে। কিন্তু পশুরাও অকৃতজ্ঞ নয়। এণ্ড্রোক্লিসতাকে না চিনতে পারলেও সিংহ তাকে চিনেছিল এবং এণ্ড্রোক্লিসকে আক্রমণ না করে তার পায়ের কাছে মাথা নত করেছিল। এই ঘটনা থেকেও নিষ্ঠুর রোমানরা কোন শিক্ষালাভ করেনি মনে হয়।

যাইহোক অতি প্রাচীনকালে ভারতেও কুস্তিখেলার প্রচলন হয়েছিল। বলা হতো মল্লক্রীড়া। আবার বীরদের মধ্যে মল্লযুদ্ধও হতো। রামায়ন ও মহাভারতে তার ভূরি ভূরি নিদর্শন আছে। বানভট্ট তাঁর কাদম্বরীতে মল্লক্রীড়াকে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যায়াম

নামে অভিহিত করেছেন। বিশেষ করে প্রাচীনকালে দক্ষিণভারতে সর্বাধিক জনপ্রিয় খেলা ছিল মল্লযুদ্ধ।

প্রাচীনকালে ইরানেও কুস্তির প্রচলন ছিল। ইরানীয়রা প্রাচীন পহ্‌লবী জাতির বংশধর। পহ্‌লওয়ান শব্দটি থেকে সম্ভবতঃ ভারতে "পালোয়ান" শব্দটির উদ্ভব হয়েছে। আসলে "কুস্তি" ফরাসী শব্দ। তুর্কী ও মুঘল আমলে ভারত সহ প্রাচ্যের অন্যান্য দেশেও কুস্তির অনুশীলন হতো। মুঘল সম্রাটদের অনেকেই কুস্তির পরম ভক্ত ছিলেন। সে সময় বিভিন্ন এলাকায় কুস্তির আখড়া গড়ে উঠেছিল। এমনকি গ্রামাঞ্চলেও।

প্রাচ্যের জাপানেও কুস্তি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কথিত আছে, খ্রীস্টপূর্ব ২৫ অব্দের দিকে জাপান নিয়মিতভাবে কুস্তি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছিল। কুস্তির ক্ষেত্রে জাপানীরা একটা বিশেষ পদ্ধতিরও প্রচলন করেছিলেন। পদ্ধতিটির নাম "সুমো"। পদ্ধতিটিকে "ভারোত্তলন" পদ্ধতিও বলা হয়। জাপানের কোন কোন সুমোবিদ ১৩৫ কিলোগ্রাম ভার উত্তোলন করতে সমর্থ হতেন বলে দাবি করা হয়েছে।

ইংলণ্ডের রাজারাও কুস্তি পছন্দ করতেন। রাজা সপ্তম হেনরি ছিলেন কুস্তির প্রধান পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু সেকালে কুস্তিতে জয় পরাজয়, কীভাবে নির্ণয় করা হতো— সে কথা আদৌ জানা যায় না। বর্তমানে এক মল্লবীর অপর মল্লবীরকে চিৎ করাতে পারলে অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বীকে আকাশ দেখাতে পারলে জয়ী বলে ধরা হয়।

আধুনিককালে ভারতে বহু মল্লবীরের আবির্ভাব ঘটেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত অনেকেই আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে রামদেও জেঠি, সুখদেও জেঠি, ভাগিরথী জেঠি, সিদ্দিকী, বুটা, গোলাম, কাল্লু, কিক্কড় সিং, রহিম, গামা, ছোট গামা, হামিদ, গুঙ্গা, ইমাম বক্স প্রভৃতি প্রধান।

বিদেশীদের সঙ্গে কুস্তির প্রতিযোগিতা ভারতে প্রথম শুরু হয়েছিল ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে। ঐ প্রতিযোগিতায় বৃটিশ চ্যাম্পিয়ান টম ক্যাননকে ভারতের রহিমবক্স পরাজিত করেছিলেন। ঐ বছরই মতিলাল নেহেরু ভারতের কয়েকজন কুস্তিবীরকে আন্তর্জাতিক কুস্তি প্রদর্শনীতে যোগদানের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। কথিত আছে ভারতীয় কুস্তিবীর গোলাম সেখানে পৃথিবীর যেকোন কুস্তিবীরের সঙ্গে লড়ার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। মাত্র একজন তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে এসেছিলেন। কিন্তু গোলাম সম্পূর্ণ ভারতীয় কায়দায় প্রতিপক্ষকে অতি অল্পসময়ের মধ্যে পরাজিত করেছিলেন। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে থেকে ভারতীয় কুস্তিবীররা বিদেশের প্রদর্শনীগুলোতে অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন দেশে যাত্রা শুরু করেন। অনেকেই সুখ্যাতি অর্জন করেন। তাঁদের মধ্যে গামা, গোবরবাবু এবং বাঙালী ভীমভবানী প্রধান। গোবরবাবু আন্তর্জাতিক

খ্যাতি লাভ করেন। তিনি জিমি ক্যামবেলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ান অব স্কটল্যান্ড, এডিনবরার জিমি এসেনকে পরাজিত করে ব্রিটিশ এম্পায়ার চ্যাম্পিয়ান এবং সানফ্রান্সিসকো শহরে অ্যাডলফ সানটেলকে পরাজিত করে বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ান খ্যাতি অর্জন করেন। অপরাজেয় মল্লবীর হিসেবে গামার খ্যাতি এখনও আছে।

বিদেশী কুস্তিগীরদের মধ্যে জার্মানের ইউজীন স্যান্ডোর নাম সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তিনি তাঁর ৪২ ইঞ্চি ছাতিকে ৬২ ইঞ্চি পর্যন্ত স্ফীত করতে পারতেন।

এবার আসা যাক বক্সিং-এর কথায়। বক্সিং বলতে কুস্তি বা মল্লযুদ্ধ নয়। এটি ও প্রাচীন খেলা। জীবনের তোয়াক্কা না রেখেই বক্সাররা বক্সিং লড়তেন। এককালে বক্সারদের কিছু অপবাদও ছিল। মনে করা হতো দস্যু। বক্সারদের দশাসই চেহারা এবং প্রতিপক্ষের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ ইত্যাদির জন্যই মনে করা হতো। একজন অপরের হাতে পঙ্গু এমনকি মারাও যেতেন। তাই পরের দিকে এই নিষ্ঠুর খেলাকে অনেকে বরদাস্ত করতে পারেননি।

সেকালে বক্সাররা হাতের মুঠোয় চামড়ার তৈরি দস্তানা পরতেন। অগ্রভাগে থাকতো নিরেট একটা সীসা বা ব্রোঞ্জের ভারি চাকতি। ঐ চাকতির আঘাত অনেকসময় গুরুতর হয়ে উঠতো। তবু প্রাচীন গ্রীসে এই খেলা প্রদর্শিত হতো এবং রোমান আমলেও এর জনপ্রিয়তা আদৌ ক্ষুণ্ণ হয়নি। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরে খেলাটি অপ্রচলিত হয়ে পড়ে ওর বীভৎসতার জন্যই।

বক্সিং খেলার পুনরায় সূচনা হয় ইংলণ্ডে—অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। প্রাচীন খেলার বর্বরতাকে পরিপূর্ণভাবে পরিহার করা হয় এবং পরিচ্ছন্নভাবে উপহার দেওয়ার পরিকল্পনা হয়। হাতে চামড়ার দস্তানা বাঁধার নীতি প্রচলিত থাকলেও ধাতব চাকতিকে একেবারে বাদ দেওয়া হলো। দস্তানার ওজনও খুব বেশি করা হলো না। মাত্র ৬ আউন্সের মত।

সাধারণত ব্যায়ামবিদরাই এই খেলায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। যেখানে বক্সিং খেলা হয় সেখানে চারদিকে কাছি ঘিরে গোলাকার বেস্টনী তৈরি হয়। বক্সাররা পেছিয়ে এসে কাছিতে ধাক্কা খেলে পুনরায় প্রতিপক্ষের দিকে ছিটকে পড়েন যেন। মুষ্টির আঘাত শরীরের যেকোন জায়গায় আঘাত করা যায় না। নির্দিষ্ট কোন কোন জায়গায় আঘাত করতে হয়। কোন বক্সার আঘাত পেয়ে পড়ে গেলে যদি ১০ সেকেন্ডের মধ্যে উঠে দাঁড়াতে না পারেন তাহলে তাঁকে পরাজিত সাব্যস্ত করা হয়। অপরদিকে কে কাকে কতবার আঘাত করেছেন সেই হিসেব থেকেও জয় পরাজয় নির্ণয় করা হয়। কেউ কাহিল হয়ে পড়লে রেফারি খেলা বন্ধ করে দিতে পারেন এবং সে এক্তিয়ার রেফারীর রয়েছে। বক্সারদের যথেষ্ট সংযত হয়ে লড়তে হয়।

তাসখেলা

তাসখেলা মনে হয় বর্তমানে সবদেশেরই একটি অতীব জনপ্রিয় খেলা। অবসর বিনোদনের একটা প্রধান উপকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সময় কাটানোর ক্ষেত্রেও অনেকের কাছে এই খেলার জুড়ি নেই। তাই তো দেখা যায়, দূরপাল্লার বাসে ও ট্রেনে অনেকেই তাস খেলেন। সারাদিন পরিশ্রমের পর শ্রমিকদেরও দেখা যায় রাস্তায় লাইটপোস্টের তলায় তাস ফেলে খেলতে। দীর্ঘক্ষণ এমনকি নাওয়া খাওয়ার সময় ছাড়া সারাটা দিন তাস নিয়ে বসে থাকতেও অনেককে দেখা যায়। শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই তাসের রমরমা। কোথাও কোথাও তাস খেলার প্রতিযোগিতাও হয়। শোনা যায়, খেলাটা ব্রিটেনে এত জনপ্রিয় যে প্রতি দশটি পরিবারের আটটিতে তাস আছে।

তাস তৈরি এবং তাসখেলা অতি পুরাতন। যাঁরা ছবি আঁকতেন, তাঁরাই তাস তৈরি করতেন। হরেকরকমের ছবির তাস। জীবজন্তু, দেবদেবী সবরকমের ছবি। তাই তাসকে প্রাচীনকালের মানুষের অন্যতম একটি চারুকলা বলে স্বীকার করা হয়। এর সৃষ্টি যে কবে-কোনকালে-তা সঠিকভাবে বলার কোন উপায় নেই। অনেকে মনে করেন, তাস প্রথম আত্মপ্রকাশ করে চীনদেশে। অতি প্রাচীনকালে চীনে কাগজী মুদ্রার প্রচলন হয়েছিল এবং সেই সময়েই শিল্পীরা কাগজের উপর ছবি এঁকে তাস তৈরি করতেন। কিছু কিছু নমুনা অবশ্য পাওয়া গেছে। তবে এইসব নমুনা দেখে বিশেষজ্ঞরা মত দিয়েছেন, তাস তৈরিকে চীনারা যত পুরাতন বলে দাবি করুক না কেন, প্রকৃত চীনা তাস তত পুরাতন নয়। হয়ত মাত্র হাজারখানেক বছর আগে চীনে তাস খেলার প্রচলন হয়েছিল। অনুসন্ধান করে আরও জানা গেছে, সেকালে শুধু চীনদেশে নয় আরবে এবং ভারতবর্ষেও তাস খেলার প্রচলন ছিল। ভারতীয় তাস ছিল গোলাকৃতি। সব তাসেই ছবি থাকতো। প্রধানতঃ দেবদেবীর মূর্তিই আঁকতেন শিল্পীরা।

যাইহোক না কেন তাস প্রাচ্যেরই আবিষ্কার এবং তাসখেলা প্রথম প্রাচ্যের দেশগুলোতেই শুরু হয়েছিল। প্রাচ্যের কাছ থেকে পাশ্চাত্যই শিখেছিল তাস তৈরি এবং তাসখেলা। সম্ভবত আরবীয়দের সঙ্গে খ্রীস্টান জগতের ধর্মযুদ্ধ তথা ক্রুসেডের (দুশ বছর ব্যাপী দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ এবং শুরু হয়েছিল তুর্কীদের দ্বারা জেরুসালেম অধিকৃত হওয়ার পর ১০৯৬ খ্রীস্টাব্দে) সময়। কারও কারও মতে প্রাচ্যের যাযাবর জিপসীরাই পাশ্চাত্যে তাস আমদানি করেছিল।

পাশ্চাত্য প্রাচ্যের কাছ থেকে তাসখেলা গ্রহণ করলেও খেলার ক্ষেত্রে এবং তাস তৈরির ক্ষেত্রে নিজস্ব চিন্তাভাবনাকে যুক্ত করেছিল। একেবারে অন্ধের মত অনুকরণ

করেনি। যারজন্য মাত্র ১০০ বছরের মধ্যে তাস পাশ্চাত্যে দারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

মধ্যযুগে তাসকে নিয়ে জুয়াখেলাও শুরু হয়েছিল। যাদুকররাও তাসকে নিয়ে নানা ধরনের খেলা দেখাতেন সে সময়। অপরদিকে জ্যোতিষীরাও তাসকে লুফে নিয়েছিলেন। তাঁরা তাসের সাহায্যে মানুষের ভাগ্যগণনা করতেন। তবে তাসকে নিয়ে জুয়া খেলা এখনও অব্যাহত এবং যাদুকর তথা ম্যাজিসিয়ানরা আজও নানা অবাক করা খেলা দেখিয়ে থাকেন।

প্রথম প্রথম পাশ্চাত্যে তাসের বাণ্ডিলে ২২টি করে তাস থাকতো। সব তাসে থাকতো বিভিন্ন ধরনের ছবি। ঐ তাসগুলোতে কোন নম্বর দেওয়া হতো না। তারপরে অনেক ভেবেচিন্তে তাসখেলাকে জনপ্রিয় করতে ৫৬টি তাসের এক একটি বাণ্ডিল করা হয়েছিল। ফরাসীরা সংখ্যাটা কমিয়ে আনে এবং প্রতিটি বাণ্ডিলে ৫৬টির পরিবর্তে ৫২টিকে অন্তর্ভুক্ত করেন। এসব তাসে ছবির পরিবর্তে নম্বর দেওয়ার প্রথা চালু করেন। শুধু তিনটি তাসে ছবির ব্যবস্থা রাখেন। সাহেব, বিবি ও গোলাম। জন্তু জানোয়ারের ছবি পরিত্যক্ত হলো। প্রবর্তিত হলো ইস্কাফন, হরতন, রুইতন ও চিরিতনের ছবি। চার রঙের ১৩ খানা করে মোট ৫২ খানা তাসের বাণ্ডিল।

পাশ্চাত্যের ঐ তাসই পর্তুগীজদের হাত হয়ে ভারত তথা প্রাচ্যের দেশসমূহে পুনরায় ফিরে এসেছে। পরিত্যক্ত হয়েছে আগেকার খেলার পদ্ধতিও। প্রথম প্রথম ঐ তাসও শিল্পীরা হাতে আঁকতেন। পরের দিকে হাতে এঁকে কাঠের ব্লক তৈরি করা হতো। কিন্তু কয়েকবার ছাপ দেওয়ার পর ছবি ভোঁতা হয়ে যেতো বলে অন্য প্রচেষ্টা শুরু হয়। এখন ছাপানো ও ব্লক তৈরির কাজ উন্নত হওয়ায় তাস তৈরিও একটা ব্যবসায় পরিণত হয়েছে।

বুমেরাং

বুমেরাং শব্দটি আজকাল অনেকেই প্রবচন হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। নিজের তৈরি অন্যায়ের জালে শেষ অবধি নিজেকেই জড়িয়ে পড়তে হয় এবং চূড়ান্ত দুর্ভোগের সূচনা হয়। এই সত্যকে এককথায় বলা হয় বুমেরাং হয়ে ফিরে আসা। বুমেরাং এক ধরনের পশুপাখি শিকারের অস্ত্র হলেও বর্তমানে কোন কোন জায়গায় খেলার বস্তু হিসেবে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

বুমেরাং-এর আদিমরূপ এক ধরনের অস্ত্র। কাঠের তৈরি। অনেকটা ধনুকের মত। দুইপ্রান্ত মাঝখান থেকে একটু একটু করে বেঁকে এসেছে। তবে ধনুকের মত ছিলা থাকে না এতে। কথিত আছে, অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা প্রথম থেকে ওকে

ব্যবহার করে আসছে এবং আবিষ্কর্তা তারাই। অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কারের পর সভ্যমানুষ ওখানকার আদিবাসীদের কাছে দেখতে পেয়েছিল অস্ত্রটিকে। অস্ত্রটির প্রধান বৈশিষ্ট্য, সুকৌশলে এটিকে কোন বস্তু বা প্রাণীর দিকে ছুঁড়ে মারলে বস্তু বা প্রাণীটিকে আঘাত করে পুনরায় নিক্ষেপকারীর হাতে ফিরে আসে। এই কারণেই "বুমেরাং" প্রবচনটির উদ্ভব হয়েছে।

বুমেরাং আগাগোড়াই কাঠের তৈরি এবং পিঠটা বাঁকানো। প্রান্তদ্বয় দুদিকে ধনুকের মত প্রসারিত হলেও ধনুকের মত দুটি প্রান্ত সমান মাপের নয়। একটা প্রান্ত অপর প্রান্ত অপেক্ষা কিছুটা লম্বা। প্রান্তদ্বয় যথাক্রমে পৃষ্ঠদেশ থেকে ৯০° ডিগ্রী এবং ১২০° ডিগ্রী কোণে বাঁকানো। ছোট, বড় দু'ধরনের বুমেরাং তারা তৈরি করে। ছোটগুলো লম্বায় ২ ফুট এবং বড়গুলো লম্বায় চার ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে।

বুমেরাং ছোঁড়া এবং পরে নিজের হাতে ফিরিয়ে আনার বিশেষ কৌশল আছে এবং এই কৌশলকে দীর্ঘকাল ধরে আয়ত্ত করতে হয়। অর্থাৎ ছোটদের বড়দের কাছে শিখতে হয়। গাছের ডালে বসা পাখিকে শিকার করতে হলে তারা ছোট ছোট বুমেরাং ব্যবহার করে। বর্তমান সভ্যজগতে খেলার সামগ্রী হিসেবে যে বুমেরাং প্রচলিত হয়েছে, তাও ছোট ছোট বুমেরাং। বড় বড় বুমেরাং তারা ব্যবহার করে বড় বড় পশু শিকারের জন্য। ওদের ভাষায় বুমেরাং-এর নাম কিলে। কিলে দু'ধরনের। এক ধরনের কিলে বা বুমেরাং নিক্ষেপ করার পর নিক্ষেপকারীর হাতে ফিরে আসে। অপর ধরনের বুমেরাং ফিরে আসে না বা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে না। সাধারণত বড় বুমেরাংগুলোই এই জাতীয়। এবং বড় পশুকে আঘাত করতে হলে বড় বুমেরাং ব্যবহার ছাড়া উপায়ও নেই। বড়গুলো ছোঁড়ার ব্যাপারে লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করার নিশানাটাই আয়ত্ত করতে হয়, ফিরিয়ে আনার কায়দা নয়।

কোন কোন বুমেরাং-এ আবার হাতল থাকে। হাতল লাগালে বুমেরাং ছোঁড়া সহজ হয়। অন্যান্য অস্ত্রের মত এতে কোন ধারালো বা ছুঁচালো ধাতব কিংবা পাথরের ফলা লাগানো থাকে না। অস্ত্রটার একমাত্র উপাদান কাঠই।

ফুটবল ও বাস্কেট বল

পণ্ডিতদের মতে মানুষের বিবর্তনের স্তরগুলো এবং আদিমানবের তৎপরতা আজকের দিনে শিশুদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। সেদিনের মানুষ অরণ্যে অরণ্যে ঘুরে বেড়াতো, গাছে তরতর করে উঠে যেতে পারতো, পাখিদের দেখলে পাথরের নুড়ি ছুঁড়ে ঘায়েল করতে চেষ্টা করতো, ইত্যাদি। শিশুরাও ছেলেবেলায় গাছে চড়তে

ভালবাসে, গাছপালার অভ্যন্তরে আত্মগোপন করতে চায়, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে পশু-পাখির চালচলন, গোল গোল মাটির ঢ্যালা বা ঢিল ছোঁড়ে-প্রায় সব কাজই। ছোট ছোট ঢিল থেকে ছোট ছোট যেকোন বল তারা যেন লুফে নেয়। হাঁটতে যখন শেখে না সে সময়ও বলকে ভারি পছন্দ করে। হাত দিয়ে বলকে গড়িয়ে দিলে বল যখন গড়াতে গড়াতে চলে যায় তখন ছোট শিশুর মুখেও আনন্দের অভিব্যক্তি ফুটে উঠে।

না, আদিমানব বল খেলতো না। আজকের মত রবারের বলও ছিল না। তারা ছিল কাজের মানুষ। কাজ ছাড়া একদণ্ডও বোধহয় বিশ্রাম করার ফুরসৎ ছিল না। খেলার কথা ভাবতেই পারতো না। তবে পাথরের ছোট-বড় বল তারা তৈরি করতো। ছোট বলকে ছুঁড়ে মারতো, আর বড় বড় বলকে পাহাড়ের ঢাল দিয়ে ফেলে দিতো নিচের দিকে। উদ্দেশ্য ছিল পশু শিকার। বড় পাথরের বলকে তাক করে গড়িয়ে দিতো ভক্ষণরত কোন তৃণভোজীর দিকে। আহত পশুকে তখন ঘায়েল করা সুবিধা হতো। তাই পশু শিকারের জন্য পাথরের নিরেট বল আদিমানবের কাছেও জনপ্রিয় ছিল এবং সেই কালেই তারা পাথরের বল তৈরি করতো। যদিও সেসব বলের উপরিভাগ খুব একটা মসৃণ ছিল না।

বলের প্রচলন থাকলেও বলকে নিয়ে খেলার পরিকল্পনা দীর্ঘকাল মানুষ করতে পারেনি। পাথরের পর ধাতুর বলও তৈরি হয়েছিল। গ্রীকরাই প্রথম বলকে খেলার কাজে নিয়োগ করে। খেলা বলতে ভারি পাথরের বল কে কতদূর ছুঁড়ে মারতে পারে তারই প্রতিযোগিতা। তাঁরা অ্যাম্বার নামে গাছের একরকম আঠাকে দিয়েও হালকা বল তৈরি করেছিলেন। সে বল ছোটরা ব্যবহার করতো এবং গড়িয়ে আনন্দ পেতো। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। রোমান আমলেও বলখেলা আদৌ প্রচলিত হয়নি।

প্রকৃত বল তৈরি করা সম্ভব হয়েছে রবারকে কাজে লাগানোর পর। রবার গাছের আঠা এবং ঐ আঠার সঙ্গে মানুষের পরিচয় দীর্ঘকালের। কিন্তু রবারের আঠালো ভাব দূরীভূত করে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা খুব বেশিদিনের ব্যাপার নয়। তাই বিভিন্ন ধরনের বল তৈরি এবং বিভিন্ন ধরনের বল খেলা উদ্ভাবিত হয়েছে আজ থেকে বড়জোর শ'দেড়েক বছর আগে। তাদের মধ্যে অন্যতম ফুটবল খেলা।

ফুটবল আমাদের দেশেও অতি প্রিয় খেলা। শহরে তো বটেই সুদূর গ্রামাঞ্চলেও গড়ে উঠেছে ফুটবল ক্লাব। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে ক্রিকেট খেলার প্রসার ঘটায় ফুটবল খেলা এবং ফুটবল প্রেমিকের সংখ্যা ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। অনেক ফুটবল ক্লাব ক্রিকেট ক্লাবে রূপান্তরিত হয়েছে। তথাপি বলতে হয়, এমন কোন কিশোর খুঁজে পাওয়া যাবে না যে ফুটবলে পায়ের আঘাত করেনি। এই জনপ্রিয়তা দেখে অনেকে

মনে করতে পারেন ফুটবল ভারতের জাতীয় খেলা। কিন্তু না, ফুটবল খেলা প্রথম ইংলণ্ডেই চালু হয়েছিল। ইংলণ্ড থেকেই ঐ খেলা ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে। ব্যতিক্রম একমাত্র উত্তর আমেরিকা। সেখানে ফুটবলের আদৌ জনপ্রিয়তা নেই।

পায়ের সাহায্যে খেলতে হয় ফুটবল। ফুটবল খেলার নিয়মকানুন প্রথম তৈরি হয়েছিল ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে। ঐ বছরই ইংলণ্ডে গঠিত হয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। নামকরণ করা হয়েছিল সেই অ্যাসোসিয়েশনের নামে "অ্যাসোসিয়েশন ফুটবল" বা "সকার"। সেই থেকে ফুটবলে দুটি দল অংশগ্রহণ করে থাকে। প্রতি দলে থাকে ১১ জন করে খেলোয়াড়। প্রথম প্রথম দল সাজানো হতো ১ জন গোলকীপার, ২ জন ব্যাক, ৩ জন হাফব্যাক এবং ৫ জন ফরওয়ার্ড। ১১ জনকে ৪ লাইনে সাজানো হতো। বর্তমানে হাফব্যাকের সংখ্যা কমানো হয়েছে এবং ব্যাকের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। ব্যাকের সংখ্যা করা হয়েছে ৪ জন।

যে মাঠে ফুটবল খেলা হয় তার দৈর্ঘ্য ১০০ থেকে ১৩০ গজ এবং প্রস্থ ৫০ থেকে ১০০ গজ। দুদিকে থাকে গোল দেওয়ার জায়গা। দুটি গোলপোস্টের দূরত্ব ২৪ ফুট এবং উচ্চতায় ৮ ফুট।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আমাদের বাংলা ফুটবল খেলায় জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে শুরু হয় আই. এফ. এ. শীল্ডের খেলা। ইংলণ্ডে ফুটবলের বড় খেলা এফ. এ. কাপের খেলা।

বাস্কেটবল আমাদের দেশে খুব একটা জনপ্রিয় না হলেও অনেক জায়গায় খেলা হয়। এটি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের খেলা এবং সেখানকার অতি জনপ্রিয় খেলা। বাস্কেটবলের খেলা দেখতে ফুটবলের মতই সেখানে প্রচুর দর্শকের সমাগম হয়। বর্তমানে ঐ খেলা অন্যতম একটি আন্তর্জাতিক খেলা হিসেবেও স্বীকৃতি লাভ করেছে।

বাস্কেটবল খেলার উদ্ভাবক জেমস এ. নইস্মিথ। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে ঐ খেলাকে চালু করেন। তাঁর চিন্তাধারা ছিল একটু অন্যরকম। খেলাটিকে তিনি নিছক আনন্দোপকরণের মাধ্যম হিসেবে চালু করেননি। তাঁর মনোভাব ছিল, তরুণদের স্বাস্থ্যবান করে তোলাই জাতির কর্তব্য। শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখতে গেলে খেলাধুলা অবশ্যই জরুরী। তিনি ভেবেছিলেন, ঐ বাস্কেটবল খেললেই তরুণদের শারীরচর্চা ভালভাবেই সম্পন্ন হবে। তাই অনেক ভেবেচিন্তে খেলাটির প্রচলন করেছিলেন এবং প্রথম প্রচলন করেছিলেন ম্যাসাচুসেট্‌স-এর স্প্রিংফিল্ড ট্রেনিং স্কুলে।

নইস্মিথ ছিলেন কানাডার অধিবাসী। খেলার নিয়মকানুনের প্রবর্তকও তিনি। বাস্কেট বলকে হাতে হাতে খেলার প্রচলন করেন। খেলার মাঠের দুদিকে থাকে দুটি কাঠের খুঁটি। ১০ ফুটের মত উঁচুতে খুঁটিতে লাগানো থাকে একটি কাঠের

পাটাতন। পাটাতনের সঙ্গে যুক্ত থাকে গোলাকার একটা বলয়। বলয়ের ভেতরে যেন অনায়াসে বলটা ঢুকে যেতে পারে। বলয় থেকে নিচের দিকে ঝোলানো থাকে জাল। অনেকটা ছাঁকনি জালের মত।

ঐ রিং বা বলয় এবং বলয়ে ঝোলানো জালকেই বলা হয় বাস্কেট। গোল করতে হলে হাতে করেই বাস্কেটে বল ফেলতে হয়।

ক্রিকেট

ক্রিকেট বিশেষ করে আমাদের দেশের কিশোরদের মধ্যে বর্তমানে অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। এর জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে বাড়ছে। ফুটবল প্রভৃতি খেলাকে বাদ দিয়ে এখন ক্রিকেট খেলা রপ্ত করতে এবং ক্রিকেট খেলার সাহায্যে শরীরচর্চা করতে অনেককে তৎপর দেখা যায়। তাই শুধু শহরে নয়, আজকাল গ্রামে গ্রামেও ক্রিকেট খেলার রমরমা। গ্রামেও তরুণরা গড়ে তুলেছে ক্রিকেট ক্লাব।

ক্রিকেট খেলা মাত্র কয়েকটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাদের মধ্যে আমাদের ভারতবর্ষ অন্যতম। ভারতীয়রা খুব অনুরক্ত ক্রিকেটের প্রতি। আগে মাত্র কয়েকটা দেশেই ক্রিকেট সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে আরও কিছু কিছু দেশে এই খেলা ছড়িয়ে পড়ছে।

ক্রিকেট খেলা প্রথমে ইংলণ্ডেই প্রবর্তিত হয়েছিল। এটি ইংলণ্ডের জাতীয় খেলা বললেও মনে হয় অত্যুক্তি হবে না। অন্যান্য অনেক খেলার মত ক্রিকেট খেলাও প্রাচীন নয়। তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এর উৎস আদিম কোন এক ধরনের বল খেলা। কারও কারও মতে প্রাচীন ফুটবল খেলা থেকে ক্রিকেট প্রভৃতি অনেক খেলারই উদ্ভব হয়েছে।

ক্রিকেট খেলার সূচনা হয়েছিল ইংলণ্ডে খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে। প্রাচীন পত্র-পত্রিকাগুলো ঘেঁটে বিশেষজ্ঞরা জানতে পেরেছেন। তবে প্রথম খবরের কাগজে ক্রিকেট খেলার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে। কাউন্টি ক্রিকেট ম্যাচ প্রথম খেলা হয়েছিল ১৭১৯ খ্রীস্টাব্দে। নিয়মকানুন বাঁধা হয় ১৭৫০ খ্রীস্টাব্দের দিকে। তখনই স্থির হয়েছিল, ক্রিকেটের পিচ লম্বায় ২২ গজ বা ২০ মিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। দুটি স্ট্যাম্প উইকেটের উচ্চতা হবে ২২ ইঞ্চি বা ৫৬ সেন্টিমিটার এবং দুটি উইকেটের মধ্যে ফাঁক থাকবে ৬ ইঞ্চি বা ১৫ সেন্টিমিটার। অবশ্য পরে নিয়মকানুনের অনেক পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। দুটির বদলে তিনটি স্ট্যাম্প ও স্ট্যাম্পের মাথায় বেল পরানো, ইত্যাদি।

১৭৫০ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে স্থাপিত হয়েছিল হ্যাম্বলডন ক্লাব। ক্রিকেটের ইতিহাসে

ক্লাবটির বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে। এটি স্থাপিত হয়েছিল হ্যাম্পশায়ার কাউন্টির হ্যাম্বলডন নামে একটি ছোট গ্রামে। সেই সময়েই "সারে" এবং "কেন্ট" প্রদেশের গ্রামাঞ্চলে খেলার যে রীতি প্রচলিত হয়েছিল সেই রীতি বর্তমানেও অনেকাংশে বহাল আছে। শোনা যায়, সেদিন সেই হ্যাম্বলটন গ্রামের ক্রিকেট খেলা বহুজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ইংলণ্ডে।

১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে লর্ডসের মাঠ ক্রিকেট খেলার জন্য নির্বাচিত হয়েছিল। এই মাঠটিও ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। মাঠটির মালিক ছিলেন টমাস লর্ড। তাঁর কাছ থেকেই মাঠটি কেনা হয়েছিল এবং তাঁরই নামানুসারে মাঠটির নামকরণ করা হয়েছিল "লর্ডসে"র মাঠ। ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে গঠিত হয়েছিল মেরিলিবোর্ন ক্রিকেট ক্লাব বা এম. সি. সি. এবং এই ক্লাবের উপরই ন্যস্ত করা হয়েছিল ক্রিকেট খেলাবার সমূহ দায়িত্ব। এই ক্লাবও কিছু কিছু নিয়মকানুনের প্রবর্তন করেছিল। ওরাই ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে উইকেটকে ২৭ ইঞ্চি বা ৬৯ সেন্টিমিটার উচ্চ করার নির্দেশ দেয় এবং তিনটি দণ্ডের প্রবর্তন করে। দূরত্ব স্থির করা হয় ৯ ইঞ্চি বা ৩৫ সেন্টিমিটার।

পরের দিকে ইংরাজরা ক্রিকেট খেলার এত ভক্ত হয়ে উঠে যে, যেখানে যেখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল এবং যেসব দেশকে অধিকারে এনেছিল সেইসব দেশেই শুরু করেছিল ক্রিকেট খেলা। জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিল। বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, অখণ্ড ভারত (বর্তমানে ভারত ও পাকিস্তান) এবং শ্রীলঙ্কায়। প্রথম টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ হয়েছিল ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে। তারপর ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দ থেকে টেস্ট ম্যাচ বেশ জমে উঠে। টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচে ভারত প্রথম অংশগ্রহণ করেছিল ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রও ছিল সেকালে ইংলণ্ডেরই উপনিবেশ। কিন্তু সেখানে ক্রিকেট খেলার প্রচলন হয়নি। তার পরিবর্তে প্রচলিত হয়েছিল "**বেসবল**" খেলা। এটিও ব্যাট এবং বলের খেলা। ক্রিকেটের মত দুটি দলই এই খেলায় অংশগ্রহণ করে। প্রতি দলে থাকে ৯ জন করে খেলোয়াড়। এটি আমেরিকার জাতীয় খেলা। বেসবল খেলায় ক্রিকেটের মত এত দীর্ঘসময় ব্যয় হয় না। ক্রিকেট দেখতে দর্শকদের প্রচুর সময়ের অপব্যয় হয় বলে আমেরিকার ধারণা।

গল্‌ফ্

গল্‌ফ্ বেশ পৃথক ধরনের এক জাতীয় খেলা। ক্রিকেটের মত এই খেলার সরঞ্জাম ব্যাট ও বল। কিন্তু দুটিই বেশ স্বতন্ত্র ধরনের। ব্যাট বটে, তবে ক্রিকেটের ব্যাটের মত নয়। একটা মোটা ধরনের লাঠি এবং যে প্রান্ত দিয়ে বলকে আঘাতে করতে

হয় সেই প্রান্তটা বাঁকানো পাতের মত চ্যাপ্টা। বলটা সাদা রঙের নিরেট রবার। ছোট অথচ ভয়ানক শক্ত। অনেকটা হকি খেলার মত হলেও দুটি দল খেলায় অংশগ্রহণ করে না। যতজন খেলায় অংশগ্রহণ করে ততজনই পৃথক পৃথকভাবে অপরাপরদের হারিয়ে খেলা জিততে চায়। দলের জয় নয়, ব্যক্তিগত জয়।

খেলোয়াড় খেলার জন্য যে লাঠিটি ব্যবহার করে তার নাম ক্লাব। লাঠির যে প্রান্তটিকে বলে ঠেকিয়ে খেলোয়াড় বলকে নিয়ে ছুটে সেই প্রান্তটি আবার ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়। আকার অনুযায়ী নাম ড্রাইভার ও নিবলিক।

গল্‌ফ্‌ খেলার জন্য বেশ বড় বড় মাঠের দরকার হয়। মাঠ কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ হতে পারে। অপরদিকে অসমতল কিংবা বালুকাময় মাঠ হলেও খেলা চলতে পারে। মোটামুটি একটি ঘাসেভরা বৃত্তাকার প্রান্তরই অধিকাংশ ক্ষেত্রে গল্‌ফ্‌ খেলার মাঠরূপে বিবেচিত হয়। খেলার ভাষায় মাঠটাকে বলা হয় লিঙ্ক। বড় বড় লিঙ্কে কয়েক'শ মিটার অন্তর অন্তর ১৮টি ছোট ছোট গর্ত থাকে। গর্তকে বলে হোল। হোলের ব্যাস ১১ সেমির মত। বল মেরে কোন একটা গর্তে বলকে ফেলতে হয়। যে খেলোয়াড় সবচেয়ে কমবার বল মেরে ১৮টি গর্তের সবটাতে বল ঢোকাতে পারে তারই জয় হয়। দুজন এমনকি কয়েকজন মিলেও গল্‌ফ্‌ খেলা যায়।

গল্‌ফ্‌ খেলা স্কটল্যাণ্ডের জাতীয় খেলা। প্রথমে খেলাটি সেইখানে শুরু হয়েছিল। তারপর ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে। আমাদের ভারতবর্ষেও কোথাও কোথাও গল্‌ফ্‌ খেলা হয়।

গল্‌ফ্‌ খেলা কবে থেকে যে শুরু হয়েছিল সেকথা বলা ভারি শক্ত। এর ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে অনেকের মতে খেলাটি বেশ প্রাচীন। ক্রিকেটের মত হাল আমলের নয়। কেউ কেউ বলতে চান গল্‌ফ্‌ খেলা রোমান আমলেই সূচনা হয়েছিল। রোমানরা তখন খেলাটিকে বলতেন "পাগানিকা"। তাঁরা চামড়া জড়িয়ে জড়িয়ে ছোট ছোট শক্ত বল তৈরি করতেন এবং বলের উপরে পাখির পালকের আচ্ছাদন দিতেন। তাঁদের গল্‌ফ্‌ খেলার লাঠি তথা ক্লাবের গঠন আজকের মতই ছিল। কথিত আছে, চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোন একসময়ে ইংরাজেরা গল্‌ফ্‌ খেলার প্রতি উৎসাহী হয়ে উঠেন এবং খেলতে শুরু করেন। একটা নমুনাও আবিষ্কৃত হয়েছে। সে নমুনা একটা গল্‌ফ্‌ খেলার ছবি। ছবিটিতে তিনজন খেলোয়াড়কে খেলতে দেখা যায়। প্রত্যেকের হাতে গল্‌ফ্‌ খেলার ক্লাব বা লাঠি। ছবিটিতে বল ও ছোট ছোট গর্তেরও হদিস পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে ছবিটি ষোড়শ শতাব্দীতে আঁকা হয়েছিল। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ছবিটিকে সুরক্ষিত করা আছে।

মনে হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতেই গল্‌ফ্‌ খেলা স্কটল্যাণ্ডে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং সেই সময়ই খেলার নিয়মকানুন বাঁধা হয়েছিল। তবে খেলা শেষ হতে অনেক

সময় ব্যয় হতো বলে জনসাধারণকে ঐ খেলা দেখতে বারণ করা হতো। তাদের সময়ের অপচয় ঘটবে বলে। তাসত্ত্বেও কিছু পরে ঐ খেলা দেখার জন্য জনসাধারণ এত মেতে উঠেছিলেন যে, তাঁদের প্রিয় খেলা "তীর নিক্ষেপ" খেলাটি উপেক্ষিত হয়েছিল। শেষে সপ্তাহের সমূহ দিনগুলোতে গল্‌ফ্ খেলা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। চার্চের নির্দেশে কেবলমাত্র রবিবার দিনটিতে খেলা নির্দিষ্ট হয়।

ইংলণ্ডে গল্‌ফ্ খেলাকে প্রাচীন ও রাজকীয় খেলা বলা হতো। অনেক রাজা ঐ খেলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে চতুর্থ জেমস, মেরি স্টুয়ার্ট অন্যতম। সম্ভবতঃ রাজারা ভালবাসতেন বলে ওকে রাজকীয় খেলা বলা হতো।

প্রথম অষ্টাদশ শতাব্দীতেই গল্‌ফ্ ক্লাব গঠিত হয়েছিল এবং এটি গঠিত হয়েছিল ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দে এডিনবরায়। তারপরে ১৭৫৪ খ্রীস্টাব্দে গঠিত হয় সেন্ট এনড্রুজ রয়্যাল অ্যাণ্ড এনসেন্ট গল্‌ফ্ ক্লাব। ঐ ক্লাবই পুরাতন নিয়মগুলির কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছিল এবং কয়েকটা নতুন নিয়মও যুক্ত করেছিল। ক্লাবের সিদ্ধান্ত অনেকে মেনে নিলেও সেদিন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র মেনে নিতে পারেনি। আমেরিকার বিশেষজ্ঞরা ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে একটি সংস্থা গঠন করেন এবং কতকগুলো নিয়ম প্রবর্তন করেন। বর্তমানে ঐ নিয়গুলোকে সবাই মেনে নিয়েছেন। এমনকি স্কটল্যাণ্ডও বিরোধিতা না করে মেনে নিয়েছে।

আইস হকি ও হকি

আইস হকি বা বরফের উপর হকি খেলা সবচেয়ে দ্রুতগামী খেলা এবং খেলায় অংশগ্রহণ করতে হলে দীর্ঘ অনুশীলনের প্রয়োজন হয়। খেলায় দুটি দলই অংশগ্রহণ করে এবং প্রতি দলে ৬ জন করে খেলোয়াড় থাকে। নানান সঙ্কট থাকার জন্য দলের অতিরিক্ত খেলোয়াড় এবং বদলি খেলোয়াড়কেও বসিয়ে রাখা হয়।

খেলার সরঞ্জাম মাথা বাঁকানো লাঠি এবং একটি রবারের চাকতির আকারের মত বল। এখন অবশ্য গোলাকার বলই ব্যবহার করা হয়। বলের নাম পাক। লাঠি দিয়ে বল মেরে এক দলের খেলোয়াড় অপর দলের নেটের মধ্যে গোল ঢোকাতে চেষ্টা করে। অপর দল বাধা দেয়। নেটের ভেতরে বল ঢোকাতে পারলেই স্কোর হয়। কে কতটা স্কোর করতে পারে তার উপরেই নির্ভর করে জয় পরাজয়। ঠাণ্ডা বরফের উপর দৌড়াতে হয় বলে প্রত্যেক খেলোয়াড়ের পায়ে। জুতোর তলায় চাকা লাগানো স্কেট থাকে। স্কেট বলতে পায়ের জুতোর তলায় মাপসই লোহার পাত। ঐ লোহার পাতের তলায়ই চারটে করে চাকা পরানো হয়।

আইস হকি কানাডার জাতীয় খেলা। বরফের দেশ বলেই। খেলাটির উদ্ভব

সম্ভবতঃ প্রাচীনকালে পারস্যে (ইরান) হয়েছিল। পোলো নামক খেলাটিও নাকি প্রাচীন পারস্যের অবদান। কথিত আছে, এক জাতীয় হকি খেলা ও গ্রীসে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং সেই হকি খেলাকেও গ্রীকরা ওলিম্পিকে স্থান দিয়েছিলেন। যদিও সে হকি আইস হকি নয়। আজকের দিনে যে হকি খেলায় আমরা অভ্যস্ত সেই হকিরই প্রাচীনরূপ। এথেন্সে প্রাপ্ত একটি প্রাচীন ছবি থেকে সেই হকি খেলার নমুনা পাওয়া গেছে। ছবিটি খ্রীস্টজন্মের প্রায় ৪০০ বছর আগে আঁকা হয়েছিল বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন।

আইস হকির জন্ম কিন্তু এতটা প্রাচীন নয়। একেবারে আধুনিক কালের বলতে হয়। ওর জন্ম বড়জোর আজ থেকে মাত্র দেড়শ বছর আগে। কেউ কেউ মনে করেন শীতকালে কিংস্টনের ওন্টারিও হ্রদের উপরিভাগ বরফে বরফে আচ্ছাদিত হয়ে যাওয়ায় কয়েকজন ইংরাজ সৈন্য উৎসাহিত হয়েছিলেন বরফাচ্ছাদিত সমতলকে দেখে এবং কী ভেবে আইস হকি শুরু করেছিলেন। সেটি সম্ভবতঃ ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে। তারপর থেকে তাঁরা নাকি ঐ খেলাই খেলতে শুরু করেন।

কথাটা কতদূর সত্য, তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে কিংস্টনে যে প্রথম আইস হকি শুরু হয়েছিল সে বিষয়ে সবাই একমত এবং ঐ কিংস্টনেই প্রথম ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে হকি লিগ গঠিত হয়েছিল।

আইস হকি এবং সাধারণ হকি ঠিক একজাতীয় খেলা নয়। সাধারণ হকি খেলার উদ্ভব হয়েছিল গ্রীকদের আমলে। ফুটবলের মত গোলেই বল ঢোকাতে হয় এবং আইস হকিতেও তাই করতে হয়। কিন্তু হকির স্টিক বা লাঠি আইস হকির স্টিক থেকে কিছুটা পৃথক। সাধারণ হকির স্টিকের মাথাটা বেশ বাঁকানো। যেন ছাতার বাঁট এবং এই হকিতে খেলোয়াড়দের পায়ে স্কেট পরতে হয় না। উভয় ক্ষেত্রেই ছোট বলকে স্টিকের ডগা দিয়ে মারতে হয় এবং স্টিকের ডগা দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে যাওয়া হয়। হকি খেলার মাথা বাঁকানো লাঠিটার নাম "হকেট"। হকেট কথাটা থেকেই "হকি" নামের উৎপত্তি হয়েছে।

হকির মাঠ খুব একটা বড় করার দরকার হয় না। দৈর্ঘ্যে ১০০ গজের মত এবং প্রস্থে ৪০ গজের মত হলেই হয়। দুদিকেই থাকে গোল দেওয়ার জায়গা। তবে ফুটবলের গোলপোস্টদ্বয়ের দূরত্বের মত এতটা ফাঁক থাকে না। মাত্র ৭ ফুট উঁচু পোস্ট এবং পোস্টদ্বয়ের দূরত্ব ১২ ফুট। একটু বৈশিষ্ট্য অবশ্য আছে। গোলের এলাকা থেকে সামনে ১৫ গজ দূরত্বে একটা অর্ধবৃত্তাকার দাগ কাটা থাকে। দাগটাকে বলে স্ট্রাইকিং। দাগের ভেতরে খেলোয়াড়কে ঢুকেই বল মেরে গোলের ভেতরে ঢোকাতে হয়।

হকি ভারতীয় খেলা নয়। তবু হকি খেলায় ভারতের যথেষ্ট সুনাম আছে অনেক

আগে থেকেই। ভারতীয় হকি খেলোয়াড় ধ্যানচাঁদের নাম যেন কিংবদন্তিতে রূপান্তরিত। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে আমস্টারডামে অনুষ্ঠিত ওলিম্পিকে ভারতের হকিদল প্রথম অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং সেই থেকে ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পরপর ৬ বার ওলিম্পিকে ভারতই স্বর্ণপদক লাভ করেছিল (১৯৪০ ও ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে ওলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়নি)। বর্তমানে ভারতের হকিদলের পূর্বগৌরব কিছুটা ম্লান হয়ে পড়েছে।

ম্যাজিক ও সার্কাস

ম্যাজিক ও সার্কাস দুটিই আমাদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। বিশেষ করে ছোটদের কাছে। যেমন রোমাঞ্চকর তেমনই চিত্তাকর্ষক।

ছোটদের কাছে ম্যাজিক বোধহয় সবচেয়ে বেশি চিত্তাকর্ষক। অসম্ভবকে যেন সম্ভব করা হয় বলে মনে করে। তারা হামেশাই মনে করে যাদুকাঠি এবং মন্ত্রশক্তি দুয়ের প্রভাবে যাদুকররা অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলেন। আমাদের দেশে ম্যাজিককে অনেকে ভোজবাজিও বলেন।

ম্যাজিসিয়ানরা কী না করতে পারেন! একটা খালি টব বা ঝুড়ি থেকে হামেশাই ফুল, পাখি, বেড়ালছানা, কুকুরছানা সবই বার করতে পারেন। ঝুলি থেকে আরও কত মজার মজার জিনিস। একটা টাকার উপর পেয়ালা উপুড় করে দিলে দশটাকা হয়ে যায়। এগুলো আবার অতি সাধারণ খেলা। মানুষকে নিমেষে উধাও করে দেওয়া, গলা কেটে দেওয়া, হাত-পা বেঁধে বাক্সের ভেতরে পুরে এবং বাক্সকে তালা বন্ধ করে গঙ্গার মত নদীতে ফেলে দেওয়া, চলন্ত ট্রেনকে অদৃশ্য করে দেওয়া ইত্যাদি কত কাণ্ড না দেখাতে পারেন ম্যাজিসিয়ানরা। চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না। তাই ম্যাজিকের আজও রমরমা। ম্যাজিসিয়ানরা দস্তুর মত গবেষণা করে তবেই সফল হন। হাতের সাফাই বা কারসাজি তো আছেই। তার উপর দর্শকদের অন্যমনস্ক করানোর জন্য চাতুরীপূর্ণ বাগ্‌জাল বিস্তার। মন্ত্রশক্তির প্রভাব আদৌ নেই।

ম্যাজিক দেখানোর ইতিহাস কিন্তু সাম্প্রতিককালের নয়। সহস্র সহস্র বছর আগে সেই মিশরীয়দের আমলেই প্রথম শুরু হয়েছিল ম্যাজিক দেখানো। সেকালে ম্যাজিসিয়ানদের অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গণ্য করা হতো এবং ম্যাজিকের মূলে মন্ত্রশক্তিকেই প্রাধান্য দিতো সাধারণ মানুষ। কাজটা করতেন সাধারণতঃ সে আমলের পুরোহিত সম্প্রদায় এবং অলৌকিক ক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে জাহির করতেন। সে ম্যাজিকের ব্যাপার পুরুষানুক্রমে তাঁরা লাভ করতেন এবং তথ্য সমূহকে গোপন রাখতেন। রোগ

আরোগ্যের ব্যাপারেও তাঁরা এমন কিছু কিছু প্রক্রিয়া অবলম্বন করতেন—যা অনেকটা ঐ ম্যাজিকের মতই ছিল। আরও মজার কথা, তাঁরা মানুষকে সম্মোহিত করতে পারতেন। ঐসব কারনে পুরোহিতদের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাভক্তি যত না ছিল তারচেয়েও বেশি ছিল ভয়। ফলে রোমান আমল পর্যন্ত পুরোহিতেরাই ছিলেন ম্যাজিক বা যাদুবিদ্যার ধারক ও বাহক এবং এঁরাই ছিলেন সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি।

পরের দিকে কিমিয়াবিদরা বহু রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত করতে সমর্থ হন এবং তাদের গুণাবলীও আবিস্কার করেন। রাসায়নিক পদার্থগুলোর সাহায্যে কিমিয়াবিদরাও আশ্চর্যজনক বস্তু দেখাতে পারতেন। তাঁরাও অনেকে একাধারে ছিলেন তথাকথিত যাদুকর।

প্রাচীন ভারতেও যাদুবিদ্যা প্রদর্শিত হতো। কিংবদন্তি আছে, ভোজবিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শিনী ছিলেন মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মহিষী ভানুমতী। ভানুমতীর পিতা ভোজরাজ নাকি যাদুসম্রাট ছিলেন। তাঁরই নামানুসারে ভোজবিদ্যা। কন্যা ভানুমতী পিতার কাছ থেকে ঐ বিদ্যা আয়ত্ত করলেও নিজেরই চেষ্টায় আরও নিপুণতা অর্জন করেছিলেন। ‘‘ভানুমতীর খেলা’’ বর্তমানে তাই প্রবাদে পরিণত হয়েছে।

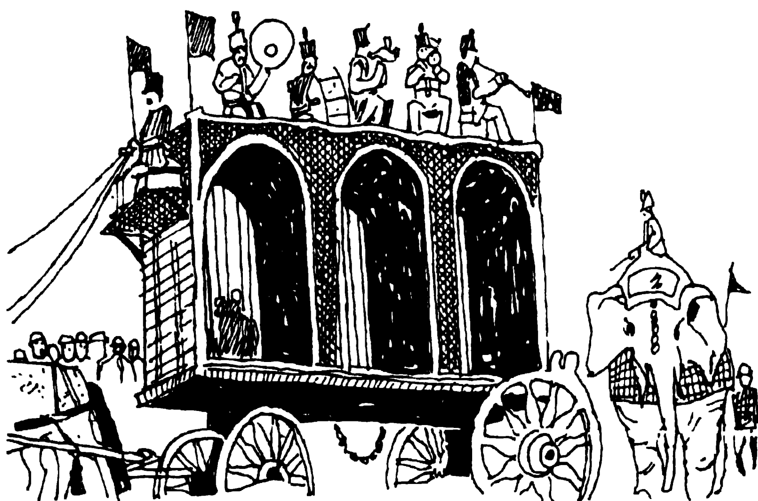
মধ্যযুগে ইওরোপে যাদুকররা বিশেষ বিশেষ জনবহুল এলাকায় যাদুপ্রদর্শন করতেন। পরের দিকে যাদু প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতো কোন কোন সংস্থা। তাতে খ্যাতনামা যাদুকরদের আমন্ত্রণ জানানো হতো। বিশেষজ্ঞদের মতে তাঁদের যাদুপ্রদর্শনের কায়দাকানুন আদৌ উন্নত মানের ছিল না। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পকেটেই রাখতেন এবং ছলছুতোয় সেগুলো দর্শকদের সামনে বার করতেন। ঐ সাধারণ ম্যাজিকের জন্যও সেকালে একটা বই রচনা করা হয়েছিল এবং প্রকাশিত হয়েছিল ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দে।

কিছু কিছু ম্যাজিসিয়ান দেশে দেশে এবং শহরে শহরে ঘুরে ম্যাজিক দেখাতেন। ম্যাজিক দেখানোর জন্য বেছে নিতেন জনবহুল কোন এলাকা বা বাজার। নানা ধরনের সাজসজ্জার উদ্ভাবকও তাঁরাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের দিকে সাজসজ্জার আরও বৈশিষ্ট্য আনয়ন করেছিলেন তাঁরা এবং নানা ধরনের উপকরণও। ঐ সময় থেকেই ম্যাজিসিয়ানরা শহরের কোন একটা হলঘর সাময়িকভাবে ভাড়া নিয়ে ‘‘ম্যাজিক শো’’ শুরু করেন।

আধুনিক ম্যাজিক ব্যবস্থার উদ্ভাবক ফ্রান্সের রবার্ট হার্ডসন। হার্ডসনকেই আধুনিক ম্যাজিকের ‘‘জনক’’ রূপে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তিনি একদিকে যেমন উন্নত কৌশল সমূহের আবিষ্কর্তা অপরদিকে তেমনই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পোশাক সমূহেরও প্রবর্তক।

ম্যাজিক বিজ্ঞানকেই অনুসরণ করে। তার সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত করতে হয় ম্যাজিসিয়ানদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা। সবচেয়ে বেশি কাজ করে হাতের কৌশল এবং দর্শকের চোখে ধুলো দেওয়ার কায়দা। যার জন্য ম্যাজিক অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। সবদেশেই যাদুপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা আছে। পৃথিবীতে যাদু দেখিয়ে বহুজনে সুনামও অর্জন করেছেন। আমাদের দেশের যাদুসম্রাট পি. সি. সরকারের নাম বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ।

ম্যাজিকের চেয়েও চিত্তাকর্ষক সার্কাস। সার্কাসের খেলা দেখতে ভাল বাসেন না এমন ব্যক্তি পৃথিবীতে একজনকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ছোটদের কাছে তো অতি প্রিয় ঐ সার্কাস।



আদিতে কিন্তু ম্যাজিক ও সার্কাস প্রায় সমগোত্রীয় ছিল। প্রকৃত সার্কাস বলতে আজকে আমরা যা বুঝি তার প্রচলন গ্রীকদের আমলেও হয়নি। সার্কাসের প্রথম সূচনা করেছিলেন রোমানরা। সেকালে সার্কাসে ব্যায়ামবিদরা ক্রীড়া প্রদর্শন করতেন। আর প্রচলিত হয়েছিল দড়ির খেলা। অর্থাৎ উপর থেকে দড়ি খাটিয়ে অনেকটা আজকের মতই খেলা দেখাতেন। তবে বর্তমানের মত এত উন্নত মানের ছিল না।

রোমানরা সার্কাস প্রদর্শনের জন্য একটা বড় মাঠকে ঘিরে রাখতেন। সেই মাঠের নামকরণ করা হয়েছিল "সার্কাস ম্যাক্সিমাস"। মাঠকে বৃত্তাকারে ঘিরে রাখা হতো। এমন একটি ময়দানের ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। সার্কাসের প্রধান আকর্ষণ জন্তু-জানোয়ারদের খেলা কিন্তু প্রথম অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। পরের দিকে ঐ রোমানরাই

সার্কাসে পশুকে আনয়ন করেছিলেন। প্রথমে শুধু ঘোড়া। ঘোড়সওয়ার ঘোড়ায় চড়ে নানা ধরনের খেলা দেখাতেন এবং মাঠময় ঘোড়াকে ছোটানো হতো।

সার্কাস প্রদর্শনের জন্য দল গঠিত হয়েছিল প্রথমে ইংলণ্ডে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। দূর দূরান্তরে ঐ দল সার্কাস প্রদর্শনের জন্য যেতেন। তাঁদের এবং সার্কাসের আসবাবপত্র বহন করতো ঘোড়ার গাড়ি। দলে থাকতেন বিশিষ্ট ব্যায়ামবিদ, যাদুকর এবং ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ার। তাছাড়া রঙ্গব্যঙ্গ প্রদর্শনের জন্য ক্লাউন বা জোকারেরও আগমন হয়েছিল ঐ সময়ে। তখন প্রবেশমূল্য নির্ধারিত হয়নি। খেলা চলাকালে সার্কাসের পরিচালক মাথার টুপি খুলে দর্শকদের সামনে পেতে ধরতেন। দর্শকরা ইচ্ছানুযায়ী টুপিতে পয়সাকড়ি ফেলতেন।

এখনও অনুরূপ ভ্রাম্যমান সার্কাসপার্টি অনেক দেশেই আছে। তারা কেবলমাত্র দু-চারটা খেলা দেখায় এবং জনবহুল এলাকাকে বেছে নেয়। দলে লোকসংখ্যাও কম থাকে এবং জন্তুজানোয়ার থাকে না। আমাদের দেশে সুদূর গ্রামেগঞ্জের বাজারগুলোতে এখনও এমন পার্টি মাঝে মাঝে চোখে পড়ে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ায় এবং নিউইয়র্ক সিটিতে সার্কাস দল গঠিত হয়েছিল। ঐ দল দুটি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। অবসর বিনোদনের এক নির্দোষ মাধ্যমরূপেও পরিচিত হয়েছিল এবং এঁরা যুক্ত করেছিলেন বেশ দুঃসাহসিকতাপূর্ণ খেলা। ঐ খেলাগুলো সহজে জনচিত্তকে জয় করতো। ওদের দেখাদেখি পরের দিকে ঐ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেই আরও অনেক ছোট ও বড় দল গঠিত হয়েছিল। কথিত আছে, সেকালে সার্কাস দেখতে খুব ভালবাসতেন আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন।

সার্কাসে ঘোড়া ছাড়া অন্যান্য জন্তুজানোয়ারদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে। প্রথম প্রথম উপযুক্ত আলোকের ব্যবস্থা না থাকায় দিনের বেলাতেই সার্কাস দেখানো হতো। খনিজ তেলকে কাজে লাগাবার পর রাতে খেলা দেখানো শুরু হয়। সার্কাসে বাজনার ব্যবস্থা কিন্তু প্রথম থেকেই ছিল। বাজানো হতো ড্রাম, ক্লারিওনেট এবং হাডিগাডি নামে এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র। হাতল ঘুরিয়ে বাজাতে হয় ঐ বাদ্যযন্ত্রটিকে। অধিকাংশ দলে থাকতো নয় নয়টি ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ার এবং কমপক্ষে সাতজন খেলোয়াড়।

১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের দিকে সার্কাসকে জনপ্রিয় করার জন্য বহু প্রতিভা নিয়োজিত হয়েছিল। সত্য বলতে কী ঐ সময় থেকেই আধুনিক সার্কাসের সূচনা হয়। প্রচলন হয়েছিল তাঁবু ফেলে সার্কাস দেখানোর প্রথা। রাতে পেট্রোমাক্স-এর বাতি জ্বেলে সার্কাস প্রদর্শনের শুরুও ঐ সময় থেকে। দলে ক্রীড়াপ্রদর্শকের সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছিল এবং ঘোড়া ছাড়া হাতী, বাঘ, ভালুক, কুকুর ইত্যাদিকেও পোষ মানিয়ে

সার্কাসের ময়দানে বার করাও শুরু হয়। আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠে সার্কাস। বিদ্যুতের যুগ ভালভাবে শুরু হওয়ায় আলোকসজ্জা সার্কাসের অন্যতম উপকরণ হয়ে উঠে। পরে পরে আরও জন্তুজানোয়ার এবং আরও বিচিত্র ধরনের ব্যালেন্সের খেলার আমদানি হয়। বর্তমানের সার্কাসে জন্তুজানোয়ারদের খেলা একটা বড় জায়গা অধিকার করেছে।

স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার

কালে কালে মানুষের সঙ্গে বহু ধাতুর পরিচয় ঘটেছে। কিন্তু প্রথম যে ধাতুটির সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়েছিল সেটি সোনা। সেই আদিকালে মধ্যপ্রস্তর যুগে গুহামানরাই আবিস্কার করেছিল সোনাকে এবং সোনা সম্বন্ধে ভারি কৌতূহলীও হয়ে উঠেছিল।

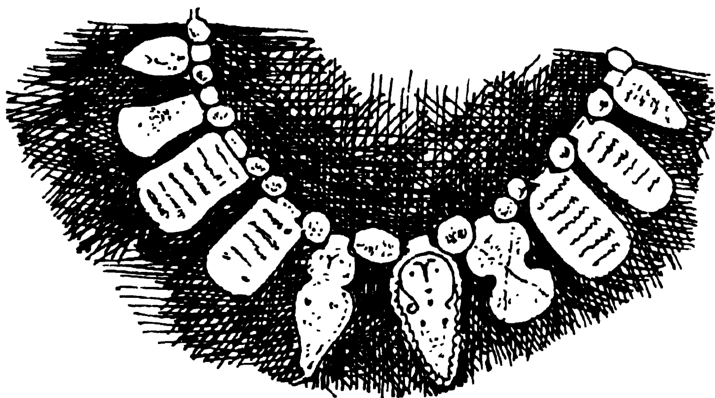
সেকালের গুহামানবরা ছিল অত্যন্ত সহজ, সরল ও অনুসন্ধিৎসু। ছোটদের মতই। তাদের মনে তখনও কোন সংস্কার গড়ে উঠেনি। ঈশ্বরভাবনাও ছিল না। একমাত্র খাদ্য-অন্বেষণ এবং পাথরের নুড়ি সংগ্রহ ছাড়া অন্য কোন চিন্তা মনে স্থান পায়নি। পাথরের নুড়ি সংগ্রহ করতে এখানে ওখানে নদীতীরে-উপত্যকায় ঘুরে বেড়াতো। প্রকৃতিতে নতুন কিছু দেখলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতো। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোন পাথর বা অন্যকিছুকে লাভ করলে সংগ্রহ করতো এবং কাজে লাগাতে চেষ্টা করতো। পাথরের নুড়ি সংগ্রহ করতে গিয়েই লাভ করেছিল সোনার নুড়িকে।

ধাতুর ব্যাপারে প্রকৃতি অত্যন্ত কৃপণা হলে কী হবে দু-একটা ধাতুকে মুক্ত অবস্থায় উপহার দিয়েছে। তাদের মধ্যে একটি ধাতু সোনা। হলুদ রঙের অতি উজ্জ্বল ও দ্যুতিসম্পন্ন সোনার টুকরো এবং রেণু সেদিন মানুষের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করেছিল। যেমন ভারি, তেমনই দীর্ঘস্থায়ী তার উজ্জ্বলতা। অথচ যেখানে সেখানে পাথরের নুড়ির মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে না। নুড়িগুলো খুব বড়ও নয়। পশুপাখি শিকারের কাজে ব্যবহারও করা যেতো না। তবু সুন্দরের পূজারী অমৃতের পুত্ররা সেই প্রাচীনকালেই মুগ্ধ হয়েছিল এবং দু-একটা যেখানে পেতো তাদের সংগ্রহ করতো।

পরীক্ষাও হয়ত করেছিল। পাথরে ঘষেছিল, পাথরের চাঁইর উপর রেখে পাথর দিয়ে সজোরে আঘাত করেছিল। বিস্মিতও হয়েছিল। পাথরের মত ভেঙে গুঁড়ো না হয়ে প্রসারিত হয়। পেটাতে থাকলে পাতের আকারও প্রাপ্ত হয়। না, কাজে লাগাতে পারেনি সেদিন। শুধু ঐ গুণটুকুই লক্ষ্য করেছিল।

নব্যপ্রস্তর যুগেও মানুষ কাজে লাগাতে পারেনি সোনাকে। সেদিন সাধারণ

পাথরই ছিল তাদের কাছে সোনার চেয়ে দামী। মানুষ যখন নগর সভ্যতার পত্তন করেছিল, যখন তাদের জীবনে নিরাপত্তা এসেছিল তখনই সৌখিন হয়ে পড়েছিল। অঙ্গ আচ্ছাদনের জন্য যেমন বস্ত্র বয়ন করেছিল তেমনই অঙ্গের শোভাবর্ধনের জন্য ডাক দিয়েছিল প্রস্তর যুগের আবিস্কৃত ঐ সোনাকে। সোনার নুড়িকে ফুটো করে গলার হার বানিয়েছিল, কানের দুলও। পুরুষ ও নারী উভয়েই ধারণ করতো। তারপরেই সোনার অলঙ্কার তৈরির প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল।



স্বর্ণালঙ্কার নির্মাণ বেশ প্রাচীন শিল্প। বেশ কিছু সংখ্যক নমুনা পাওয়া গেছে এবং তাদের সযত্নে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এগুলোর অধিকাংশই ইওরোপের রাজরাজড়াদের ধনভাণ্ডারে রক্ষিত ছিল। যে অলঙ্কারটিকে পণ্ডিতেরা সুপ্রাচীন বলে নির্দেশ করেছেন, সেটি একটি গলার হার। খ্রীস্টজন্মের প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে আসিরীয় আমলে এটি নির্মিত হয়েছিল। অতি সুন্দর এবং অপূর্ব তার কারুকার্য। সেকালে যেখানে যেখানে নগর সভ্যতার পত্তন হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল, খনন কার্যের ফলে সেইসব ধ্বংসস্তূপ থেকে কিছু না কিছু স্বর্ণালঙ্কার পাওয়া গেছে। ভারতের মহেঞ্জোদড়ো এবং হরপ্পা থেকেও।

গ্রীক ও রোমান আমলে রাজন্যবর্গ সোনাকে ভারি পছন্দ করতেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই সোনাকে মূল্যবান ধাতুরূপে চিহ্নিত ও প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সোনার প্রতি দারুণ লোভ ছিল তাঁদের। অপরের রাজ্য লুণ্ঠন করতেন একমাত্র সোনার কারণে। ক্ষমতাশালীরা রাজভাণ্ডার পূর্ণ করে রাখতেন সোনা ও সোনার অলঙ্কারে। সেই ধারা চলে এসেছিল দীর্ঘকাল। মধ্যযুগে ইওরোপীয়রা মনে করতেন ভারতের পথেঘাটে সোনা ছড়ানো আছে। তাই তারা ভারতে আসার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। যদিও সক্ষম হয়নি। পরের দিকে বহু লুণ্ঠনকারী লুণ্ঠন চালিয়েছিল এবং প্রচুর সোনা

লুঠ করে নিয়ে গেছে ভারতবর্ষ থেকে। সেসব কাহিনী ইতিহাস থেকেই লাভ করা যায়।

সোনাকে সে আমলেও এত মূল্যবান মনে করা হয়েছিল যে, কিমিয়াবিদরা কৃত্রিম উপায়ে সোনা তৈরি করতে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাঁরা পরশপাথর বানাতে চেয়েছিলেন। পারেননি। অলীক গল্পরূপেই প্রচলিত আছে।

ভৌগোলিক আবিষ্কারের যুগে আবিষ্কারকদের অনেককে উদ্বুদ্ধ করিয়েছিল ঐ সোনা সংগ্রহ। কলম্বাসকেও। স্পেনীয়রা সোনা সংগ্রহের নিমিত্তই বহু অভিযানকারীকে প্রেরণ করেছিল পৃথিবীর বহু জায়গায়। কোথায় কোথায় সোনা পাওয়া যায় সে তথ্যও সংগ্রহ করার জন্য দিকে দিকে প্রেরণ করা হয়েছিল অভিযাত্রীদের। ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দেই প্রথম কালিফোর্ণিয়ায় আবিস্কৃত হয়েছিল সোনার খনি। পরের বছরই স্বর্ণসন্ধানীদের সেখানে প্রেরণ করা হয়েছিল। অতঃপর ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে আবিষ্কৃত হয় অস্ট্রেলিয়ায়। পরে পরে আবিষ্কৃত হয় আরও বহু স্বর্ণখনি। তাদের মধ্যে ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে আবিষ্কৃত ব্রিটিশ কলম্বিয়ার, ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে আবিষ্কৃত দক্ষিণ আফ্রিকার এবং ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে আবিষ্কৃত আলাস্কার স্বর্ণখনি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে পৃথিবীর বেশির ভাগ স্বর্ণ সংগ্রহ করা হয় দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল অঞ্চল থেকে। উত্তর আমেরিকার এবং রাশিয়ার স্বর্ণখনিও বিখ্যাত। ভারতের কর্ণাটকে কোলার স্বর্ণখনি থেকেও কিছু সোনা পাওয়া যায়।

সোনাকে এখনও মূল্যবান ধাতু মনে করা হয় এবং এর চাহিদাও সমানে চলে আসছে। অলঙ্কার শিল্পে সোনার তুলনা আজও নেই। জলীয় বাষ্প, ক্ষার, অ্যাসিড প্রভৃতি সোনার কোন ক্ষতি করতে পারে না। শুধু অম্লরাজ বা অ্যাকোয়ারেজিয়া (এক ভাগ গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড ও তিন ভাগ গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মিশ্রণ) সোনাকে দ্রবীভূত করতে পারে। সোনাকে ধাতুরাজ বলা হয়। ঐ কারণে ঐ মিশ্রণটাকে বলা হয় অম্লরাজ। সোনা তাপ ও তড়িতের উত্তম পরিবাহী। মরিচাও ধরে না। সে কারণে ওকে বর ধাতু বা নোবেল মেটালও বলা হয়।

তামা

সোনার মত তামাকেও প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। তবে মুক্ত তামার পরিমাণ বর্তমানে খুব বেশি নেই। ইতালী, রাশিয়া, সুইডেন ও আমরিকার কয়েকটা খনি থেকে কিছু কিছু মুক্ত তামা পাওয়া যায়। মনে হয় তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগের মানুষরা মুক্ত তামাকে প্রায় নিঃশেষ করে দিয়ে গেছে।

পণ্ডিতদের মতে, মানুষ সোনার পরে যে ধাতুটির সন্ধান পেয়েছিল সেই ধাতুটিই

হল তামা। নব্যপ্রস্তর যুগের শেষের দিকেই মানুষ তামার সন্ধান পেয়েছিল এবং তামাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছিল। তবে পাথরের বদলে তামাকে ব্যবহার করতে সময় লেগেছিল প্রচুর। মানুষ তার সাবেক আমলের পাথরের অস্ত্রশস্ত্রকে সহজে পরিত্যাগ করেনি। তামার মহিমা ধরা পড়ে আবিষ্কারের অন্ততঃ হাজার বছর পরে; তখনই পাথরের অস্ত্রশস্ত্র এবং পাথরের আসবাবপত্র পরিত্যক্ত হয় এবং মানুষ তামাকেই কাজে লাগাতে শুরু করে। পণ্ডিতেরা ঐ সময়কালকে তাম্রযুগ আখ্যা দিয়েছেন এবং এই যুগের অবসান ঘটে লোহাকে কাজে লাগাবার ব্যবস্থা হলে। শুরু হয়েছিল লৌহযুগের। প্রাচীন নগর সভ্যতা তথা সুমেরীয়, মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, সিন্ধু প্রভৃতি সভ্যতা ছিল তাম্র যুগের সভ্যতা।

পণ্ডিতদের গবেষণা থেকে জানা যায়, মানুষ তামার সন্ধান পেয়েছিল খ্রীস্টজন্মের চার হাজার বছরেরও আগে। কেমন করে যে সেকালের মানুষ তামার সন্ধান পেয়েছিল সে বিষয়ে সবাই একমত নন। কারও কারও মতে পাথর খুঁড়তে গিয়েই লাল রঙের নমনীয় এই ধাতুটির সন্ধান পেয়েছিল। কিন্তু সহজে পোষ মানাতে পারেনি।

তামাকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে অনেকে একটা আকস্মিক ঘটনার অনুমান করে থাকেন। গুহাবাস কালে পৃথিবীর আবহাওয়া মনোরম ছিল না। তুষার যুগ চলছিল আর কনকনে শৈত্য প্রবাহ। খ্রীস্টজন্মের প্রায় দশ হাজার বছর আগে তুষার যুগটা ধীরে ধীরে অপসারিত হতে থাকে। আরও কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর পরিবেশ মনোরম হয়ে উঠে এবং মানুষ গুহা পরিত্যাগ করে। শুরু করে যাযাবরের জীবন। এক এক জায়গায় তারা খুব বেশিদিন থাকতো না। খাদ্যের ঘাটতি দেখা দিলে অন্যত্র সরে যেতো। অনেক আগে থেকেই তারা আগুন জ্বালাতে শিখেছিল এবং বন্যজন্তুদের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য রাতে বাসস্থানের চারদিকে আগুন জ্বালিয়ে রাখতো। কোন কোন দল হয়ত বা সবুজ রঙের তামা পাথরের উপর সাময়িক বাসস্থান গড়েছিল এবং আগুনে ঐ সবুজ পাথর গলে গিয়ে আগুনের মত গনগনে লাল হতে দেখেছিল। আরও লক্ষ্য করেছিল, তাপ দিলে নরম হয়ে যায় এবং ঠাণ্ডা হলে আগের মতই শক্ত হয়ে পড়ে। সেই থেকে ঐ সবুজ সবুজ পাথরকে কাজে লাগাবার চিন্তা আসে মাথায়। কেউ আবার মনে করেন, তামাযুক্ত এলাকায় বসতি স্থাপনের সময় কোন এক অগ্নিকাণ্ড থেকে মানুষ তামা পাথরের স্বরূপ বুঝেছিল। কেননা, তামা মাত্র ৭০০° ডিগ্রী সেলসিয়াস থেকে ৮০০° ডিগ্রী সেলসিয়াসের মত তাপ সৃষ্টি হলে গলে যায়। তামা পাথরের উপর কাঠ জ্বালাতে থাকলে কিংবা অগ্নিকাণ্ডের ফলে তামা গলা সম্ভব।

যাই হোক তামার ঐ বৈশিষ্ট্যটি (আগুনের সংস্পর্শে গলে যায় এবং ঠাণ্ডা হলে

পুনরায় শক্ত হয়ে যায়) আবিস্কারের পর মানুষ পাথরের পরিবর্তে তামাকেই কাজে লাগাতে শুরু করেছিল। তবে সব দল একসঙ্গে কাজে লাগাতে পারেনি। অধিকাংশই প্রস্তর নিয়ে ব্যস্ত ছিল। যারাই তামাকে কাজে লাগাতে শিখেছিল তারাই প্রবল হয়ে উঠেছিল। পাথর অপেক্ষা তামার হাতিয়ার ছিল উন্নত। পাথরের অস্ত্রের মত সহজে ভোঁতা হয়ে পড়ে না এবং একে ঘষে ঘষে সবসময় ধারালো করা যায়। তামা ব্যবহারকারীরা প্রস্তর ব্যবহারকারীদের সহজে হটিয়ে দিয়ে পত্তন করেছিল নতুন এক সভ্যতার। সেই সভ্যতাই তাম্রযুগের সভ্যতা নামে খ্যাত। ওরাই পরের দিকে ব্রোঞ্জ এবং পেতলকে আবিষ্কার করেছিল। ব্রোঞ্জ ও পেতল দুটিই সঙ্কর ধাতু। পেতলের গলনাঙ্ক তামার থেকেও কম এবং ব্রোঞ্জের কাঠিন্য তামার থেকে অনেক বেশি। ব্রোঞ্জকে পালিশ করা যায়। তামার সঙ্গে দস্তা (60 . 40) এবং তামার সঙ্গে টিন (৪৪ : 12) মেশালেই পেতল ও ব্রোঞ্জ পাওয়া যায়। আদিতে তারা মেশাবার পদ্ধতি জানতো না বা দস্তা এবং টিনকেও আবিষ্কার করতে পারেনি। এমন কিছু কিছু অঞ্চলের তামা পাথর প্রকৃতিতে ছিল যার সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় থাকতো দস্তা বা টিন। সেইসব পাথর গলিয়েই তারা প্রথম পেতল ও ব্রোঞ্জ তৈরি করতো এবং তাও ছিল তাদের অভিজ্ঞতার ফল।

হাপর

হাপর এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। সেই কোন আদিকাল থেকে কর্মকাররা ওকে ব্যবহার করে আসছেন। লোহাকে গলাতে, পিটিয়ে পাত করতে বা প্রয়োজনীয় রূপ দিতে, পুরাতন ভোঁতা লোহার অস্ত্রকে পুনরায় ধারালো করতে হাপরের জুড়ি নেই। প্রকৃতপক্ষে হাপরের আবিস্কারের ফলেই লোহাকে কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে।

যাঁরাই কামারশালায় গিয়েছেন তাঁরাই হাপর দেখেছেন। আজকের বিদ্যুতের যুগে হাপরের ব্যবহার সঙ্কুচিত। তবু হাটে, বাজারে, শহরে এখনও অনেক কর্মকার পূর্বের ধারাকে অনুসরণ করছেন এবং প্রত্যেকেই হাপর নামক যন্ত্রটি রেখেছেন। হয়ত আরও দীর্ঘকাল থাকবে।

হাপরের কাজ কাঠকয়লার উনানে বাতাসকে ভালভাবে চালিত করে উনানের তাপমাত্রাবৃদ্ধি। হাপরের পূর্বে হয়ত নলের ভেতর দিয়ে ফুঁ দিয়ে বাতাস পাঠিয়ে উনান জ্বালানো হতো। এখনও গ্রামেগঞ্জে মেয়েরা কাঠের উনান জ্বাল"ত অনেকে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। স্বর্ণকাররাও ব্যবহার করেন। রসায়নাগারে বাঁকানো নলে ফুঁ দিয়ে কাঠকয়লার গর্তে রাখা লবণকে যেমন উত্তপ্ত করা হয়। এরই উন্নত রূপ হাপর। মুখে ফুঁ দিতে হয় না। উনানের ভেতরে থাকে একটা লোহার নল।

তার চারপাশে সাজানো থাকে কাঠকয়লা। নলের অপর প্রান্ত একটা বড় চামড়ার থলের সঙ্গে যুক্ত। থলেটা সামনের দিকে অর্থাৎ যে মুখে নল লাগানো থাকে সে মুখটা সরু। বাহিরের দিকটা ক্রমশ চওড়া। উপরে ও তলায় কাঠের পাটাতন থাকে। তলার পাটাতনে একটা গোলাকার ছিদ্র থাকে এবং ভেতরে ঐ ছিদ্রটাকে ঘিরে একটা চামড়ার ভালব থাকে। হারমোনিয়ামের হাতলের মত ভাঁজ করা চামড়ার মত। উপরের পাটাতনের শেষ প্রান্তের সঙ্গে একটা দড়ি বেঁধে এবং দড়ির অপর প্রান্তকে উপরে অনুভূমিকভাবে ঝোলানো একটা বাঁশ অথবা নলাকার কোন দণ্ডকে বেড় দিয়ে নিচের দিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। ঝোলানো দড়িতে টান দিলে চামড়ার থলেতে তলার ভালব আলগা হয়ে বাতাস ঢুকে পড়ে এবং থলেটা ফেঁপে উঠে। উপরের পাটাতনটা ভারি। দড়িতে টান বন্ধ হলেই থলের তলার ভালব বন্ধ হয়ে যায়। বাতাসের একমাত্র বহির্গমন পথ নল দিয়ে বার হয়। দড়িটা বারবার টানতে হয় এবং আলগা করতে হয়। প্রচুর বায়ু উনানে প্রবেশ করার ফলে উনান দাউ দাউ করে জ্বলে এবং তাপমাত্রাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। সেই তাপমাত্রায় লোহা নরম হয়ে উঠে এবং পিটিয়ে ইচ্ছানুরূপ রূপ দেওয়া যায়।

লোহা গলাবার এই সরঞ্জামটি আবিস্কৃত হয়েছিল গ্রীক আমলে। সেকালে গ্রীসে যেমন বড় বড় দার্শনিক ও বিজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করেছিলেন তেমনই জন্মগ্রহণ করেছিলেন কয়েকজন অসামান্য প্রতিভার অধিকারী প্রযুক্তিবিদ। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অ্যানারকাসিম। তাঁর আবির্ভাবকাল খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী।

অ্যানারকাসিম বিজ্ঞানীও ছিলেন। তবে নতুন নতুন যন্ত্র আবিস্কারের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল বেশি। উনানের উপর বাতাস পাঠাতে নলে ফুঁ দেওয়ার পরিবর্তে তিনি বুদ্ধি করে হাপর তৈরি করেছিলেন। তাঁর ঐ আবিস্কারের ফলেই লোহাস্ত্র তৈরি করার ক্ষেত্রে সত্যই যুগান্তর আসে।

হাপর গ্রীকদের আবিষ্কার হলেও সে আমলে হাপরের মত কোন যন্ত্র ভারতও আবিষ্কার করেছিল। যন্ত্রটির বিবরণ কোথাও নেই। তবে সেই সময় ভারত যে উন্নত মানের লৌহাস্ত্র এবং কলঙ্কহীন ইস্পাত তৈরি করতে পারতো তার বহু নজির আছে। তেমন যন্ত্র না হলে ভারত লোহা পাথরকে গলাতে পারতো না বা উন্নত ধরনের অস্ত্রও তৈরি করতে পারতো না। কথিত আছে, গ্রীকবীর আলেকজান্ডার ভারতের অস্ত্রশস্ত্র দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং উন্নত মানের বহু অস্ত্র সংগ্রহও করেছিলেন। কয়েকজন ভারতীয় অস্ত্রনির্মাতাকেও সঙ্গে করেছিলেন আলোকজাণ্ডার। দুর্ভাগ্য ভারতের। নির্মাণ কৌশল এবং সেকালে তাদের উদ্ভাবিত যন্ত্রের বর্ণনা কোথাও লাভ করা যায় না। হয়ত লিপিবদ্ধ হয়েছিল। হারিয়ে গেছে পরবর্তীকালে। হারিয়ে যাওয়ার মূলে অন্যান্য অনেক কারণের মধ্যে তুর্কীদের আক্রমণ এবং পুরাতন

পাণ্ডুলিপিগুলোকে জ্বালানো প্রধান কারণ। তক্ষশিলা, নালন্দা ও বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত সহস্র সহস্র পাণ্ডুলিপিকে তারা ধ্বংস করে গেছে। প্রমাণ করার কোন সূত্র আজ নেই ভারতের।

চাকা

মানব সভ্যতা আজ যেন চাকার উপর দাঁড়িয়ে আছে। হাঁ, চাকা। কোথায় চাকার দরকার হয় না। যে কোন স্থলযান তো বটেই, চক্রাকারে পাখা ঘোরানোর ব্যবস্থা থাকে জলযানে ও আকাশযানেও। সত্য বলতে কী, চাকাই মানব সভ্যতাকে সচল করেছে এবং ধাপে ধাপে এগিয়ে দিয়েছে উন্নতির শীর্ষে। যতকাল মানব সভ্যতা থাকবে ততকাল অব্যাহত থাকবে চাকার ব্যবহার।

চাকাকে তাই এক যুগান্তকারী আবিষ্কাররূপে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যে বা যাদের মাথায় এই পরিকল্পনা প্রথম এসেছিল তার বা তাদের তুল্য প্রযুক্তিবিদের সঙ্গে কারও তুলনা চলে না। পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধরদের অন্যতম বললেও অযৌক্তিক হবে না।

কিন্তু কবে আবিষ্কৃত হয়েছিল চাকা? প্রথম চাকা কেমন ধরনের ছিল? চাকার উপাদান কী ছিল? কাঠ না পাথর?

এর জবাব কিন্তু পাওয়া যাবে না। তবে পণ্ডিতদের মতে প্রথম কাঠের চাকাই তৈরি করেছিল মানুষ এবং চাকা প্রাগৈতিহাসিক যুগের আবিষ্কার। কুমোরদের চাক আরও পরের ঘটনা, তারও পরে পাথরের চাকা—ফসল গুঁড়া করার জন্য পাথরের চাক।

আদিম কাঠের চাকার নমুনা পাওয়া যায়নি। সম্ভবও নয়। সহস্র সহস্র বছরের ব্যবধানে মাটিব তলায় কাঠ কোনও প্রকারে থাকতে পারে না। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই মাটিতে বসবাসকারী পোকা ও জীবাণুরা একরকম নিঃশেষ করে ফেলে। তাই কোন ধ্বংসাবশেষ থেকে কাঠের চাকার নমুনা সংগ্রহ করা যায়নি। সেই কারণে জানা যায়নি আদিম চাকার প্রকৃতরূপ।

পণ্ডিতদের মতে প্রকৃত চাকা তৈরি হতে সময় লেগেছে প্রচুর। হাজার হাজার বছর। যদিও চাকার উপযোগিতা সম্বন্ধে মানুষ ওয়াকিবহাল হয়েছিল নব্যপ্রস্তর যুগের শেষের দিকে। হয়ত আজ থেকে সাত হাজার বছর আগে। ে সময় তারা বন থেকে কাঠ কেটে আনতো। গুঁড়িগুলোকে গড়িয়ে গড়িয়ে নিয়ে যেতো দূরে—বহুদূরে নদী কিংবা হ্রদের তীরে। গুঁড়িগুলোকে বহন করা দু-চারজনের সাধ্যের বাহিরে ছিল। গুঁড়িকে গড়িয়ে গড়িযে নিয়ে যাওয়ার সময় উপলব্ধি করেছিল, মাটির

ঘর্ষণকে গোলাকার জিনিস উপেক্ষা করতে পারে। সেই উপলব্ধি থেকে তারা কোন এক সময় চাকা বানাতে শুরু করে এবং ঠেলাগাড়ির মত গাড়ি তৈরি করে। দুটো চাকাকে অক্ষদণ্ডের দুদিকে জুড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করতেও সময় লেগেছিল প্রচুর।

প্রথম চাকা অতি সাধারণই ছিল। গাছের গুঁড়ির প্রস্থচ্ছেদ ছিল চাকা। পাথরের করাত দিয়েই কাটতো। মাঝখানে ছিদ্রও করতো পাথরের বাটালি দিয়ে। গরুর গাড়ির চাকার মত বাঁকানো কাঠ জুড়ে গোল চাকা তৈরি করা এবং চাকার সঙ্গে পাখি বা স্পোক যুক্ত করা হয়েছিল নগর সভ্যতার যুগে। এই ধরনের প্রথম চাকা মনে হয় কুম্ভকারের চাক।

যাই হোক দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল চাকার বিবর্তন। বিবর্তনের শেষ ধাপের চিত্র লাভ করা গেছে সুমেরীয় ও মিশরীয়দের আঁকা ছবি থেকে। প্রথম সুমেরীয়রাই চাকা লাগিয়ে রথ তৈরি করেছিল খ্রীস্টজন্মের প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে। সুপ্রাচীন নমুনাও পাওয়া গেছে। পরবর্তীকালে আঁকা মিশরীয়দের রথের ছবি পাওয়া গেছে অনেক। সেকালে রথ প্রধানতঃ রাজারাই ব্যবহার করতেন। পরের দিকে যুদ্ধক্ষেত্রেও ব্যবহার শুরু হয়।

গবেষকদের ধারণা, প্রাচীন নগর সভ্যতাগুলির সবাই একই সঙ্গে রথ তৈরি করতে পারেনি। মিশরীয়রা চাকার ব্যবহার আয়ত্ত করেছিল হিক্‌কস নামে এক দুর্ধর্ষ-জাতির মানুষের কাছ থেকে। সম্ভবত খ্রীস্টজন্মের মাত্র দেড় হাজার বছর আগে। মনে হয় আর্যদের আগমনের পূর্বে ভারতেও রথের প্রচলন ছিল না। আর্যরাই যুদ্ধের কাজে নিয়োগের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক রথ তৈরি করেছিলেন। রথ এবং উন্নত ধরনের লৌহাস্ত্রের সাহায্যে তাঁরা এদেশে প্রভুত্ব স্থাপন করেছিলেন। আর্যদের আগমনের পূর্বে ভারত ব্রোঞ্জযুগেই ছিল।

লৌহযুগেই কাঠের চাকার চারদিকে লোহার পাতের বেড় পরানো হয়েছিল মাটির ঘর্ষণকে ভালভাবে উপেক্ষা করার জন্য। এই চাকার যুগই চলেছিল দীর্ঘকাল। একরকম আধুনিককালেই চাকার উপর রবারের টায়ার ও টিউব পরানো হয়েছে— সাইকেল আবিষ্কৃত হওয়ার পরে। চাকার বিবর্তনও এসেছে এবং বিভিন্ন কাজের উপযোগী চাকাও তৈরি হচ্ছে।

পারদ ও আর্সেনিক

পারদ ধাতু বটে, কিন্তু তরল। অপর কোন ধাতু তরল নয়। দেখতে রূপার মত সাদা এবং উজ্জ্বল। মৌলিক অবস্থায় প্রকৃতিতে পারদকে আদৌ পাওয়া যায়

না। পারদের প্রধান আকরিকের নাম সিনাবার। বাংলায় আমরা হিঙ্গুল বলি। টকটকে লাল। সেই প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয়রা হিঙ্গুলের সঙ্গে পরিচিত। যদিও প্রকৃতিকে হিঙ্গুলকেও খুব একটা বেশি পাওয়া যায় না।

পারদের আবিষ্কারও প্রাগৈতিহাসিক যুগে। প্রথম ঐ হিঙ্গুল থেকেই নিষ্কাশিত হয়েছিল পারদ। কারও কারও মতে খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে পারদ আবিষ্কারের কৃতিত্ব অ্যালকেমিস্ট বা কিমিয়াবিদদের। অবশ্য হিঙ্গুল (Hgs) থেকে পারদ নিষ্কাশন আদৌ কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল না বলেই সম্ভব হয়েছিল। হিঙ্গুলকে পোড়ালেই পারদ পাওয়া যায়। বর্তমানেও হিঙ্গুলকে প্রথমে বাতাসে তাপ জারিত করা হয়। তাতেই উৎপন্ন হয় মারকারি অক্সাইড। পরে আরও উত্তাপ প্রদান করলে পাওয়া যায় ধাতুরূপে পারদ [$2Hgs + 3O_2 = 3Hgo + 2So_2$, $2Hgo = 2Hg + O_2$]।

প্রাচীনকালে ভারত ও তার নিজস্ব পদ্ধতিতে পারদ নিষ্কাশন করেছিল। এক্ষেত্রেও আবিষ্কর্তা ভারতীয় কিমিয়াবিদরা। পারদ আবিষ্কারের সঙ্গে ভারতীয় অন্যতম শ্রেষ্ঠ কিমিয়াবিদ নাগার্জুনের নাম জড়িত। ভারতে মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক দার্শনিক নাগার্জুন কিনা কে জানে? ইনি সিঁদুরকে পুড়িয়ে পারদ তৈরি করেছিলেন এবং পারদকে পুড়িয়ে পারদভস্ম তৈরি করতেন। সেই পারদভস্ম ব্যবহার করা হতো ওষুধরূপে। ভারতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্রে পারদভস্মের ব্যবহার বহু প্রাচীন। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় তাঁর History of Hindu Chemistry নামক গবেষণামূলক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ভারতের প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রগুলিতে ১৮ রকম পারদঘটিত যৌগের উল্লেখ আছে। পারদের এতগুলি যৌগ সেকালে কোন দেশই উৎপাদন করতে পারেনি।

মধ্যযুগে ভারতীয় কিমিয়াবিদরা পারদ থেকে সোনা তৈরির প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এই প্রচেষ্টা সত্যই বড় আশ্চর্যজনক। এখন আমরা জানতে পেরেছি পারদের পরমাণুক্রমাঙ্ক ৮০ এবং সোনার পরমাণুক্রমাঙ্ক ৭৯। পারদের পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে একটি মাত্র প্রোটনকে সরাতে পারলেই সেটি সোনায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই সত্যটি কী সেদিন ভারতীয় কিমিয়াবিদরা টের পেয়েছিলেন! তা নাহলে এত ধাতু থাকতে থাকতে তাঁরা সোনা বানাতে পারদকে বেছে নিয়েছিলেন কেন? আজ অবশ্য পারদকে সোনায় পরিণত করানো এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। যদিও আধুনিক পদ্ধতিতে পারদকে সোনায় পরিণত করতে গেলে যে খরচ পড়বে তার চেয়ে অনেক কম মূল্যে বাজারের সোনা পাওয়া যায়। তাই পারদ থেকে সোনা তৈরি করা হয় না।

আর্সেনিক নামক মৌলটিও সম্ভবত ভারতের আবিষ্কার। এরও আবিষ্কর্তা সেদিনের সেই কিমিয়াবিদ নাগার্জুন। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে আর্সেনিককে বলা হয়েছে

সেঁকোবিষ। এটি ধাতু নয়। কিছু কিছু ধাতবগুণ থাকার জন্য নাম দেওয়া হয়েছে ধাতুকল্প। আর্সেনিককেও সেকালে ওষুধরূপে ব্যবহার করা হতো। বিষচিকিৎসা নামে খ্যাতি ছিল। অন্যান্য সমূহ ওষুধ ব্যর্থ হলে প্রয়োগ করা হতো আর্সেনিক বা সেঁকোবিষকে।

আর্সেনিককে প্রকৃতিতে অতি সামান্য পরিমাণে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। অতি বিষাক্ত। বর্তমানে সচরাচর আর্সেনিক পাইরাইটিস (FeAsS) থেকে আর্সেনিককে নিষ্কাশন করা হয়। বিষ হিসেবেই ওর ব্যবহার বেশি। পরিমাণে কিছু বেশি পেটে গেলে মানুষেরও মৃত্যু অবধারিত। যদিও আমাদের শরীরে আর্সেনিকের একটা সহ্যসীমা আছে। সহ্যসীমার অতিরিক্ত হলে মৃত্যু হয় না ঠিকই, কিন্তু নানা ধরনের বিষক্রিয়া হয় এবং চামড়ার ক্ষতরোগ দেখা দেয়। ক্রমাগত আর্সেনিকযুক্ত খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করতে থাকলে তার পরিণাম যে কত ভয়ঙ্কর হয়, তার প্রমাণ বর্তমানের আর্সেনিক দূষণ। দূষণ ঘটছে পানীয় জলের মাধ্যমে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৬৮টি ব্লক বর্তমানে আর্সেনিক দূষণের আওতায়। বহু মানুষ পঙ্গু হয়ে পড়েছেন, কারও কারও বা চামড়ার ক্যানসার।

আর্সেনিক দূষণ ছড়াচ্ছে ভূগর্ভ থেকে যথেচ্ছভাবে জল উত্তোলনের ফলে। পানীয় জলের চাহিদা মেটাতে এবং কৃষিকাজে জলসেচের জন্য ভূগর্ভে সঞ্চিত জলকে উত্তোলিত করতে হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ এমনকি কোটি কোটি বছর ধরে ভূগর্ভে যে জল সঞ্চিত হয়েছিল মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে প্রচুর পরিমাণে জল উত্তোলনের ফলে ভূগর্ভের জলস্তর বেশ কিছুটা নিচে নেমে গেছে। ভূগর্ভে যেখানে যেখানে আর্সেনিক পাইরাইটিসের স্তর বিদ্যমান সেসব স্তরে জলস্তর নিচে নেমে যাওয়ায় বায়ুর সংস্পর্শে আসায় আর্সেনিক পাইরাইটিস আর্সেনিয়াস অক্সাইডে পরিণত হচ্ছে। ঐ অক্সাইড অল্পমাত্রায় হলেও জলে দ্রবীভূত হয়। ভূস্তরে পুনরায় জল প্রবেশ করলে সেই জলে আর্সেনিকের পরিমাণ বেড়ে যায়—যা মানুষের সহ্যসীমার বাহিরে। পানীয় জল হিসেবে ঐ জলকেই গ্রহণ করতে হচ্ছে এবং তারই ফলে আর্সেনিক দষণ ছড়িয়ে পড়ছে। ধীরে ধীরে যেন ভয়াবহ আকার ধারণ করছে।

সমস্যাটি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বহু প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। উঠেপড়ে লেগেছেন বহু সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা। প্রয়োজন হয়ে পড়েছে প্রতিটি অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিকের অস্তিত্ব নির্ণয় করা। জলে আর্সেনিকের উপস্থিতি এবং তার পরিমাণ নির্ণয় করার নতুন নতুন অনেক পদ্ধতিও আবিস্কৃত হয়েছে। তবু একটা অতি সহজ ও প্রাচীন পদ্ধতি আছে। টেস্টটিউবে ভূগর্ভস্থ জল নিয়ে তাতে অ্যালুমিনিয়ামচূর্ণ ও গাঢ় পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করে টেস্টটিউবের মুখে সিলভার নাইট্রেট সিক্ত কাগজ ধরলে যদি কালো হয়ে যায় তাহলে জলে আর্সেনিকের

অস্তিত্ব আছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

জলে দ্রবীভূত আর্সেনিকের পরিমাণ নির্ণয় করতে হলে অতিরিক্ত ম্যাগনেসিয়া মিক্সচার বিকারক হিসেবে জলে প্রয়োগ করতে হয়। এতে জলে দ্রবীভূত সমূহ আর্সেনিক অধঃক্ষিপ্ত হয়। অধঃক্ষেপকে ছেঁকে ও ধৌত করে উত্তপ্ত করলে পাওয়া যায় $Mg_2As_2o_3$। ওজন থেকেই নির্ণয় করা যায় আর্সেনিকের পরিমাণ।

পরমাণুর কল্পনা

পদার্থের পরমাণুর কল্পনা বহু প্রাচীন। যদিও হাল আমলে পরমাণু সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রথমে প্রচার করেছিলেন জন ডালটন ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে। ঐ কারণে তাঁকে পরমাণুবাদের "জনক" আখ্যা দেওয়া হয়।

ডালটনের মতবাদ অনুযায়ী পরমাণু মাত্রেই পদার্থের অতি ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য অন্তিম কণা। বর্তমানের বিজ্ঞান ডালটনের এই মতবাদকে ভুল প্রমাণ করলেও পরমাণুবাদের প্রবর্তক হিসেবে ডালটন বিজ্ঞানে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

আরও উল্লেখ করা যায়, পরমাণুর কল্পনা প্রথম ডালটন করেননি। তিনি বৈজ্ঞানিক মতবাদ খাড়া করেছিলেন। পরমাণুর কল্পনা করেছিলেন খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীক পণ্ডিত ডিমোক্রিটাস। ডিমোক্রিটাসও পদার্থের সংগঠক অতি ক্ষুদ্র কণা বা পরমাণুর কল্পনা করেছিলেন। কিন্তু ডালটনের মত বিশ্লেষণ করেননি। তবু পরমাণুর ব্যাপারে ডালটনের সঙ্গে ডিমোক্রিটাসের নামও উচ্চারণ করা হয়।

গ্রীক ডিমোক্রিটাসেরও আগে পরমাণুর কল্পনা করেছিলেন একজন ভারতীয় দার্শনিক। নাম কণাদ। "কণা" কথাটিই কণাদের নাম আজও বহন করে চলেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে ভারতীয় বিজ্ঞানী কণাদের নাম উপেক্ষিত। ডিমোক্রিটাস এবং জন ডালটনের মতই কণাদের কণাবাদ। কণাদ মতে পরমাণু অতি ক্ষুদ্র এবপং সর্ববস্তুর মূল উপাদান। কোন বস্তুকে ক্রমাগত বিভাগ করতে থাকলে সর্বশেষে যে অবিভাজ্য অংশ পাওয়া যায় তাইই কণা বা পরমাণু। ডালটনের মতের সঙ্গে অনেকটাই মিলে যায়। কণাদ অবশ্য "সর্ববস্তু" কথাটা ব্যবহার করেছেন। সর্ববস্তু বলতে মিশ্র ও যৌগিক পদার্থকেও অন্তর্ভুক্ত করা যায় এবং এইখানেই কণাদের ত্রুটি। তবু প্রাথমিক কল্পনা হিসেবে এই ত্রুটিকে উপেক্ষা করা যায়। ডালটন মৌলিক ও যৌগিক উভয় পদার্থের পরমাণুর কথা উল্লেখ করেছিলেন। যৌগিক পদার্থের পরমাণুর নামকরণ করেছিলেন যৌগপরমাণু। পরের দিকে ডালটনের ভ্রম সংশোধন করেছিলেন অ্যাভোগেড্রো ১৮১১ খ্রীস্টাব্দে অনুবাদ প্রচারের মাধ্যমে।

কণাদ অণু সম্বন্ধে কিছু না বললেও পরমাণুর সংযোগের কথা উল্লেখ করেছিলেন। দুটি পরমাণু একত্রে দ্ব্যণুক গঠন করে এবং পরমাণু ও দ্ব্যণুককে খালি চোখে যে দেখা যায় না সেকথাও উল্লেখ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও কণাদ অবহেলিত হয়েছেন। অবহেলিত ভারতও।

সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের কারণ এবং গ্রহণ চক্র

সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণের কারণ সম্বন্ধে বর্তমানে সবাই অবহিত আছেন। সবাই জানেন, সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে এবং পৃথিবীর চারদিকে প্রদক্ষিণ করছে চন্দ্র। কোন পূর্ণিমা তিথিতে সূর্য ও চন্দ্রের মাঝখানে পৃথিবী অবস্থান করলে এবং তারা একই সরলরেখায় এলে চন্দ্রগ্রহণ হয়। পৃথিবী ও চন্দ্রের নিজস্ব কোন আলোক নেই। সূর্য ও চন্দ্রের মাঝখানে পৃথিবী এলে পৃথিবীর ছায়ায় চন্দ্র আংশিক অথবা পূর্ণভাবে ঢাকা পড়ে।

বিপরীতক্রমে অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্র থাকে সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে। ঐদিনও যদি সূর্য, চন্দ্র এবং পৃথিবী একই সমতলে অবস্থান করে তাহলে সূর্যকে আড়াল করে চন্দ্র এবং পৃথিবীর মানুষ দেখে সূর্য আংশিক অথবা পূর্ণভাবে ঢাকা পড়ে। কখনও কখনও সূর্যের বলয় গ্রহণও দেখা যায়। পৃথিবী এবং চন্দ্র সবসময় পরিক্রমারত অবস্থায় আছে বলে সব অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় একই সরলরেখায় আসতে পারে না। ফলে সব অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় গ্রহণও দেখা যায় না। দেখা যায় বিরলভাবে।

সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে প্রচলিত সংস্কারসমূহকে বিশ্লেষণ করলে মনে হবে বুঝিবা গ্রহণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক কারণ আধুনিক বিজ্ঞানেরই অবদান। কিন্তু কথাটা আদৌ ঠিক নয়। অনেক পূর্বে খ্রীস্টজন্মের প্রায় পাঁচশ' বছর আগেও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কোন যন্ত্রের সাহায্য না নিয়ে গ্রহণের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করতে পেরেছিলেন। এ ব্যাপারে প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অবদানও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী একই সমতলে তথা একই সরলরেখায় অবস্থান না করার একটা বিশেষ কারণ আছে। কারণটি সম্ভবতঃ ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর্যভট্টের গবেষণায় ধরা পড়েছিল। আর্যভট্ট খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। পৃথিবী যে একটা গোলক এমন কল্পনাও তিনি করেছিলেন। কমলালেবুর মত না বলে তিনি উল্লেখ করেছিলেন পৃথিবী ''কদম্বপুষ্পের'' মত বর্তুল। পৃথিবীকে বর্তুলাকার কল্পনা করার জন্যই ধরতে পেরেছিলেন গ্রহণের প্রকৃত নিয়মাবলী।

আর্যভট্টের আগে বৈদিক যুগের জ্যোতিষীরা আবিষ্কার করেছিলেন রবিকক্ষ (বর্তমানের আলোয় পৃথিবীকক্ষ), অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে সূর্যকে যে পথে পৃথিবী পরিক্রমা করতে দেখি সেই কক্ষপথ এবং চন্দ্রের কক্ষপথ এক সমতলে অবস্থান করছে না। সামান্য বক্রভাবে অবস্থান করছে দুটি কক্ষ। বক্রভাবে অবস্থান করার জন্য দুটি কক্ষ পরস্পর পরস্পরকে উপরে ও নিচে দুটি বিন্দুতে ছেদ করেছে। কৌণিক ব্যবধান মাত্র ৫ ডিগ্রী। উপরের ছেদবিন্দুটিকে ভারতীয় জ্যোতিষীরা "রাহু" নাম দিয়েছিলেন এবং নিচের ছেদবিন্দুর নাম রেখেছিলেন "কেতু"। আধুনিক বিজ্ঞান ঐ দুটি বিন্দুর নামকরণ করেছে যথাক্রমে অ্যাসেন্ডিং নোড (উচ্চপাত বিন্দু) এবং ডিসেন্ডিং নোড (নিম্নপাত বিন্দু)। রাহু ও কেতু পরবর্তীকালে পৌরাণিক কাহিনীগুলো এক অসুরের মুণ্ড ও ধড় রূপে উপস্থাপিত করেছে। রাহু ও কেতু সম্বন্ধে সংস্কারও গড়ে উঠেছে সেই থেকে। আর বৈজ্ঞানিক সত্যটা চাপা পড়ে গেছে পুরোপুরিভাবে। দুর্ভাগ্য, আমরা আজও সেই সংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারিনি।

আর্যভট্টের পূর্বে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা আরও ধরতে পেরেছিলেন, প্রতিবছর কমপক্ষে দুবার চন্দ্র রাহুর (উচ্চপাত বিন্দু) সমীপবর্তী হয়। কিন্তু কেতুর কাছাকাছি নাও হতে পারে। চন্দ্র রাহুর সমীপবর্তী হলে সূর্যগ্রহণ হয় এবং কেতুর সমীপবর্তী হলে হয় চন্দ্রগ্রহণ। তাই বছরে দুটি সূর্যগ্রহণ অবশ্যই হয় এবং চন্দ্রগ্রহণ আদৌ নাও হতে পারে।

খ্রীস্টজন্মের অনেক আগেই চীন প্রভৃতি দেশ প্রতি ১০০ বছরে গ্রহণের মোট সংখ্যাও নির্ধারণ করেছিলেন। তাঁরা সেই প্রাচীনকালেই লিপিবদ্ধ করেছিলেন। প্রতি ১০০ বছরে গ্রহণের মোট সংখ্যা হয় ৩৯১টি। এদের মধ্যে ২৩৭টি সূর্যগ্রহণ এবং ১৫৪টি চন্দ্রগ্রহণ।

খ্রীস্টজন্মের প্রায় ৫০০ বছর আগে কেলেডীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা করেছিলেন। তাঁরা সে আমলেই উল্লেখ করেছিলেন গ্রহণের পুনরাবৃত্তি ঘটে। ২১৩ চান্দ্রমাসে বা ১৮ বছর ১১ দিনে চন্দ্রের কেতুদ্বয় পৃথিবীর চারদিকে একবার পূর্ণ আবর্তন সম্পন্ন করে বলে ধরে নিয়েছিলেন। তাই সময়টাকে ধরেছিলেন একটি "কল্প" । প্রতি কল্পে স্থান দিয়েছিলেন ২৭টি চন্দ্রগ্রহণ এবং ৪২টি সূর্যগ্রহণকে। আরও প্রমাণ করেছিলেন পূর্ববর্তী কল্পের গ্রহণগুলো পরবর্তী কল্পে পুনরায় ঘটে থাকে। একই দিনে কিন্তু একই সময়ে নয়। পূর্বের কল্পে যে দিনে এবং যে সময়ে যে গ্রহণ হয়েছিল পরবর্তী কল্পে যেই দিনে ৮ ঘণ্টা পরে সেই গ্রহণই দেখা যায়। গ্রহণের এই চক্রকে তাঁরা নাম দিয়েছিলেন "স্যারোস চক্র"।

কেলেডীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা গণনার মাধ্যমে আরও স্থির করেছিলেন, প্রতি ৩ কল্প পরে অর্থাৎ ৫৪ বছর, ১ মাস পরে আগেকার প্রতিটি গ্রহণ একই দিনে, একই

সময়ে এবং একই জায়গা থেকে দেখা যায়। এইভাবে চলে ১২০০ বছরের একটি চক্র। ১২০০ বছরের এই চক্রটি আজও জ্যোতির্বিজ্ঞানে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ঐ হিসেব থেকে গ্রহণ কবে, কোথায় এবং কোন সময়ে দেখা যাবে সেকথা আগে থেকেই অতি সহজে বলে দেওয়া যায়।

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান আরও বহু তথ্য যোগ করেছে সত্য কিন্তু সেদিনের সেই আবিষ্কারগুলো এখনও গুরুত্ব হারায়নি।

রান্নার উপায়

আমরা কিছু কিছু সুস্বাদু ফল, মূল, কন্দ, সব্জী প্রভৃতিকে কাঁচা অবস্থায় খেতে অভ্যস্ত হলেও অধিকাংশকে রান্নার মাধ্যমে গ্রহণ করতে হয়। শস্য, সব্জী, মাছ, মাংস প্রভৃতিকে রান্না না করলে মুখে তোলা যায় না। তাছাড়া ওদের রান্না করাটাই বিধেহ। রান্না না করা খাদ্য সুস্বাদু হয় না। সুস্বাদু তথা রসনা তৃপ্তিকর না হলে যত পুষ্টিকর ও যত খাদ্যপ্রাণসমৃদ্ধ হোক না কেন শরীর তাকে গ্রহণ করতে চায় না। ফলে শরীরে বিরুদ্ধক্রিয়াই ঘটে। তাছাড়া রান্না না করা খাদ্যে নানা ধরনের জীবাণুও থাকে। আগুনের তাপে তারা নষ্ট হয়ে যায়।

এখন প্রশ্ন, খাদ্যকে রান্নার মাধ্যমে সুস্বাদু করে তোলার পরিকল্পনা কবে মানুষের মাথায় এসেছিল? প্রথম কীভাবে রান্নার ব্যবস্থা করেছিল মানুষ?

সম্ভবতঃ গুহাবাসকালে মানুষ আবিস্কার করেছিল রান্নার প্রথম পর্যায়। না, উপকরণ কিছুই ছিল না। শুধু অগ্নিদগ্ধ। তার পূর্বে মানুষের সঙ্গে আরণ্যের পশুর খুব একটা তফাৎ ছিল না। না স্বভাবে, না আচার ব্যবহারে। তারা পশুর মাংস কাঁচা অবস্থায় খেতো। শুধু ছালটা ছাড়িয়ে ফেলতো। খাদ্যগ্রহণের ক্ষেত্রে পশুর সঙ্গে অবশ্য একটু তফাত ছিল। তৃণভোজীরা তৃণ, শাক-পাতা প্রভৃতি খেতো এবং মাংসাশীরা কেবল মাংস ভক্ষণ করতো। কিন্তু মানুষ তার খাদ্যতালিকায় দুটিকেই অন্তর্ভুক্ত করেছিল। ফলে খাদ্যকষ্টে তাকে পড়তে হতো না। গাছের ফল, মূল, কচিপাতা থেকে কাঁচা মাছ, মাংস, শামুক, গুগলি সবাই খেতো। যখন যা পাওয়া যায়, তাই আর কী?

এই অবস্থায় চলেছিল কত হাজার হাজার বছর। তারপর শুভক্ষণে একদিন মানুষ আগুনের দাহিকাশক্তির পরিচয় পেলো এবং অগ্নিদেবতাকে বন্দী করলো। প্রথমে গুহাকে গরম রাখতে এবং অরণ্যের হিংস্র জন্তুদের আক্রমণ প্রতিহত করতে গুহার চারদিকে আগুন জ্বালিয়ে রাখতো।

বিশেষজ্ঞদের মত মানুষ প্রথম অগ্নিদগ্ধ মাংসের স্বাদগ্রহণ করেছিল এবং সেটি

ঘটেছিল আকস্মিকভাবে। হয় কোন প্রাণী অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা পড়েছিল এবং সেই অগ্নিদগ্ধ পশুমাংসের স্বাদ গ্রহণ করেছিল, নতুবা সদ্য শিকার করা অর্ধমৃত কোন প্রাণী ছিটকে পড়েছিল তাদের দ্বারা প্রজ্বলিত আগুনের মধ্যে। অতি কষ্টে সংগ্রহ করা শিকারকে পরিত্যাগ না করে খেয়েই ছিল। তখনই অমৃতের পুত্ররা লাভ করেছিল অমৃতের স্বাদ। সেই থেকে কাঁচা মাংস গ্রহণ বন্ধ হয় এবং অগ্নিদগ্ধ মাংসই গ্রহণ করতে শুরু করে। তবে সব দল একই সঙ্গে মাংসকে আগুনে ঝলসে খাওয়া শুরু করেনি। ধীরে ধীরে পদ্ধতিটি ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রথম রান্না বলতে ঐ অগ্নিদগ্ধ মাংস। পরে মনে হয় মাংস ছাড়া অন্যান্য খাদ্যসামগ্রীকেও আগুনে পুড়িয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা নেয়।

কিন্তু কোনকিছুকে আগুনে পোড়ালে তো তাকে রান্না বলা যাবে না! রান্নার জন্য চাই উনান, রান্নার পাত্র ও প্রয়োজনীয় উপকরণ!

এগুলোর আবিষ্কার করতে কিন্তু সময় লেগেছিল ঢের। এই পদ্ধতিগুলির কিছু কিছু মানুষ আবিষ্কার করেছিল গুহাবাসের সময়। বিশেষ করে উনান তৈরি ও পাথরের পাত্র নির্মাণ। পাথরের পাত্রে জল ঢেলে খাদ্যসামগ্রীকে সুসিদ্ধকরণের পদ্ধতি বোধ হয় গুহাবাসের শেষের দিকে আষ্কিার করেছিল। হয়ত আজ থেকে মাত্র দশ হাজার বছর আগে। তার কিছু আগে পণ্ডিতেরা মনে করেন, পাথরের পাত্রের পরিবর্তে খাদ্যবস্তুকে সেদ্ধ করার জন্য মানুষ তৈরি করেছিল চামড়ার তৈরি কেটলি। সে কেটলি মূলত চামড়ার থলি ছাড়া কিছু নয়। গর্তের মুখে দু-তিনখানা পাথর দাঁড় করিয়ে উনান বানিয়েছিল এবং সেই উনানের উপর চাপাতো চামড়ার কেটলি।

সে খাদ্য শুধু সেদ্ধ করা খাদ্য। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শুধু পশুমাংসকেই সেদ্ধ করতো। মশলা? না, আদৌ ব্যবহার করতো না। নুনও নয়। রান্নার ব্যাপারে মানুষ কিছুটা উন্নতিসাধন করেছিল নব্যপ্রস্তর যুগের শেষের দিকে। মানুষ ততদিনে মৃৎপাত্রকে তৈরি করে পোড়াতে শিখেছিল। ফলে রান্নার উপযোগী বিভিন্ন সরঞ্জামও তৈরি করেছিল। হাঁড়ি, কড়াই-র মত জিনিস, পাথরের খুন্তিজাতীয় জিনিস ইত্যাদি। মশলা হিসেবে নুনের মাহাত্ম্যই প্রথম উপলব্ধি করেছিল। সেও আকস্মিক ব্যাপার বলতে হবে। হ্রদের তীরে বসবাসের সময় নোনা হ্রদের জলে রান্না করতে গিয়েই বুঝেছিল, সেদ্ধ খাবারে নুনের জল দিলে খাবার সুস্বাদু হয়। মানুষ সেসময় যাযাবরও হয়ে উঠেছিল। সম্ভবত সন্ধান পেয়েছিল নুনের খনির। সেই নুনই খাদ্যে ব্যবহার করতো। সুগন্ধি মশলা ইত্যাদির আবিষ্কার হয়েছিল ঐ যাযাবর জীবনে অভ্যস্ত হওয়ার ফলে। মোটামুটি খাদ্যে খাদ্যলবণ প্রয়োগই প্রথম কৃতিত্ব ছিল তাদের। অবশ্য নুনের প্রতি আকর্ষণ সেকালে ও একালে শুধু মানুষ নয়, গবাদি পশুরও ছিল এবং

আছে। এখনও লোনামাটি দেখলে গবাদি পশুরা চেটে খায়। মানুষও মুখের আলুনি ভাঙ্গিতে সেদিন নুন বা লোনামাটির খোঁজ করতো। নুনের চাহিদাও প্রত্যেকের শরীরে। কেননা, শরীরের একটা বিশেষ উপাদান সাধারণ লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড। ঐ যৌগটি প্রস্রাব ও ঘামের সঙ্গে বেরিয়ে যায় এবং তার ঘাটতি পূরণ করতে হয় নুন খেয়ে। ঐ চাহিদা আরণ্যক যুগের মানুষদেরও ছিল। তাই সেইকালেই লবণের সন্ধান পেয়েছিল তারা। পরে রান্নার কাজে অর্থাৎ সেদ্ধখাদ্যকে সুস্বাদু করতে ডাক দিয়েছিল লবণকে। তেল, হলুদ, লঙ্কা, জিরে, গোলমরিচ, দারুচিনি, এলাচ ইত্যাদির ব্যবহার অনেক পরে।

সাবান

সাবান বর্তমানে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলোর মধ্যে অন্যতম। পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্করণ থেকে গাত্রমার্জনা সর্বত্রই সাবান বা সাবানের অনুরূপ কোন পদার্থকে ব্যবহার করে থাকি। যদিও কাপড়চোপড় সাফ করার কাজে সে সাবান ও ডিটারজেন্ট বর্তমানে ব্যবহার করা হয় ঠিক সেই একই জিনিস গাত্রমার্জনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করি না। গায়ে দেওয়ার জন্য বিশেষ ধরনের সাবান ব্যবহার করা হয়। তবে সব সাবানের মূলে আছে ক্ষারজাতীয় সামগ্রী। হ্যাঁ, আজকের দিনের ডিটারজেন্ট পাউডার বা গুঁড়ো সাবানেও।

মানুষ যেদিন বস্ত্র বয়ন করেছিল, সেইদিনই বুঝতে পেরেছিল বাহিরের ধুলাময়লার সংস্পর্শে কাপড় মলিন হয়ে উঠে। তাকে পুনরায় পরিষ্কার করার উপায় তাকে আবিষ্কার করতে হয়েছিল। ক্ষার সম্বন্ধে হয়ত তাদের কোন ধারণা ছিল না। তবু আবিষ্কার করেছিল, সামুদ্রিক অথবা সমুদ্রতীরে উৎপন্ন নানা ধরনের উদ্ভিদকে। ওদের পুড়িয়ে ছাই তৈরি করতো এবং ঐ ছাই দিয়ে কাপড়কে সেদ্ধ করতো। তারপর পাথরের চাঁই বা কাঠের গুঁড়ির উপর আছড়াতো। পরে প্রকৃতিতে আরও অন্যান্য উপকরণ খুঁজে পেয়েছিল, যা সোডিয়াম কার্বনেট ছাড়া অন্য কিছু নয়। সেসব কথা ধোপাখানা বা লন্ড্রী প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু গাত্রমার্জনা? না, গুহাবাসকালে মানুষ স্নানই করতো না। অঙ্গের আবরণ পশুচর্মকেও পরিষ্কার করতো না। সেদিন জলকে ভয় পেতো মানুষ। জলে নামতই না। জল খেতে হলে জলার ধারে গিয়ে উপুড় হয়ে মুখ ঠেকিয়ে জল পান করতো। একটা ছোট্ট নালাকেও অতিক্রম করতে ভয় পেতো। নব্যপ্রস্তর যুগেও সম্ভবত মানুষ স্নানের কথা ভাবেনি। যখনই হ্রদ কিংবা নদীর উপর ঘর বেঁধেছিল তখনই হয়ত আচমকা স্নানের সুখ উপলব্ধি করেছিল। পরের দিকে শরীরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে

গিয়ে অনুভব করেছিল স্নানের উপযোগিতা।

মানুষ সৌখিন হয়ে উঠেছিল নগরসভ্যতা পত্তনের পরে। সৃষ্টি হয়েছিল রাজপদ। রাজারা ছিলেন আরও সৌখিন এবং বিলাসীও। যাঁরা রাজাকে বা রাজকার্যে সাহায্য করতেন তাঁরাও। সেসময় তাঁরা গায়ে সাবান ব্যবহার করতেন না। স্নানের আগে অলিভ ওয়েল মেখে গাত্র মার্জনা করতেন। গায়ে ও মুখে প্রলেপ দিতেন বিশেষ বিশেষ ফলের রস কিংবা কোন কোন গাছের মূল বা কন্দের রস। এমনকি স্নানের আগে গুল্মজাতীয় কোন কোন গাছের ছাই দিয়েও অঙ্গ মার্জনা করতেন। এদেরই গায়ে সাবান দেওয়ার পূর্ব-প্রস্তুতি বলা যেতে পারে। তবে ঠিক কোন সময় সাবান তৈরি হয়েছিল সেকথা সঠিকভাবে বলা যায় না। বলা যায় না কীভাবে সাবান তৈরি হয়েছিল!

সাবানের উল্লেখ করেন প্রথম প্লিনি তার বিশ্বকোষে (খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দী)। প্লিনির উক্তি থেকে জানা যায়, তাঁর সময় দু'ধরনের সাবানের প্রচলন ছিল। শক্ত সাবান এবং নরম সাবান। প্লিনির মতে দু'ধরনের সাবানই "গল"রা আবিষ্কার করেছিলেন। প্লিনির সময়ই পম্পিয়াই শহর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। বর্তমানে ঐ ধ্বংসাবশেষ থেকে সাবান জাতীয় পদার্থ উদ্ধারও হয়েছে। দুঃখের বিষয় সেকালের মানুষ কীভাবে যে সাবান তৈরি করতো সেকথা প্লিনি উল্লেখ করেননি।

প্লিনির বর্ণনা থেকে আজকের পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন, সাবান তৈরির পদ্ধতি অতি পুরনো দিনের আবিষ্কার। তবে সেসময় সাবান শিল্প গড়ে উঠেনি। প্রয়োজনমত ঘরেই বানানো হতো এবং এর ব্যবহারও ছিল সঙ্কুচিত। সাধারণ মানুষ সাবান ব্যবহার করতেন না। উল্লেখ করতে হয় যে, আজকের দিনে আমরা যাদের হার্ড সোপ বা শক্ত সাবান এবং সফ্‌ট সোপ বা নরম সাবান বলি, এগুলো আজকের দিনের দেওয়া নাম নয়। প্রাচীনকালেই উদ্ভব হয়েছিল এবং সেইকালেই নামকরণ করা হয়েছিল।

শক্ত সাবান বলতে বোঝায় উচ্চ আণবিক গুরুত্ব বিশিষ্ট ফ্যাটি অ্যাসিড তথা স্টিয়ারিক অ্যাসিড ও পামিটিক অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণকে এবং এদেরই পটাসিয়াম লবণকে বলা হয় নরম সাবান।

বর্তমানে বাণিজ্যিক পদ্ধতিতেই সাবান তৈরি হয়। চর্বি ও উদ্ভিজ্জতেলের সঙ্গে কস্টিকসোডা মিশিয়ে উত্তাপ প্রদান করতে থাকলেই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সাবান উৎপন্ন হয়। প্রথমে বড় বড় লোহার কড়াই বা কেটলিতে চর্বি, তেল (বাদাম তেল, নারকেল তেল বা এই জাতীয়) কস্টিকসোডা এবং ক্ষারের জলীয় দ্রবণ একত্রে মেশাতে হয়। তারপর ঐ মিশ্রণকে উত্তপ্ত করা হয় স্টীমের সাহায্যে। বিক্রিয়া সম্পন্ন হতে সময় লাগে এবং বিক্রিয়া সম্পূর্ণ হলেই প্রয়োগ করা হয় গাঢ় লবণের দ্রবণ

বা ব্রাইন ওয়াটার। লবণ জল প্রয়োগ করলেই মিশ্রণটি দুটি স্তরে বিভক্ত হয়ে যায়। উপরের স্তরে সাবান এবং নিচে থাকে গ্লিসারল, জল, লবণ এবং অতিরিক্ত ক্ষার। সাবান তৈরি করতে গিয়ে উপরি পাওনা হিসেবে (বাই প্রোডাক্ট) লাভ করা যায় গ্লিসারল।

উপরের সাবানের স্তরটাকে ছেঁকে এনে পুনরায় ফুটাতে হয়। তাতেই পৃথক হয় সাবান। গরম অবস্থায় নরম থাকে। ঠাণ্ডা করলেই শক্ত হয়ে যায়। গরম থাকাকালেই নির্দিষ্ট রূপ দেওয়া হয় এবং এই সাবানই কাপড় কাচা সাবান।

গায়ে দেওয়া সাবান তৈরি করতে হলে উপরোক্ত উপায়ে প্রাপ্ত সাবানকে আরও বিশুদ্ধ করতে হয়। অশুদ্ধিগুলো সহ অতিরিক্ত ক্ষারকেও সরাতে হয়। তারপর প্রয়োগ করা হয় রঙ ও সুগন্ধি। গরম থাকতে থাকতেই ওকে ছাঁচে ফেলা হয়।

প্রথম সুগন্ধি আতর

সুগন্ধের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরকালের। হয়ত সেই ভয়ানক আরণ্যক জীবনেও একান্ত কাজের মানুষরা বনফুলের মধুর গন্ধে আকৃষ্ট হতো। হয়তবা দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে প্রাণভরে আঘ্রাণ নিতো। অবশ্য ফুল পেড়ে কিংবা ফুল হাতে নিয়ে বিলাসিতা করার চিন্তা কেউ করেনি।

ফুলের মধুর গন্ধে আকৃষ্ট হয় ইতর জীবজন্তু থেকে কীটপতঙ্গরাও। সুগন্ধি পদার্থ মিশিয়ে মাছের চার তৈরি করা হয় এবং সেই চার পুকুরে ফেলে ছিপে মাছ ধরেন অনেকে। রাতে যেসব ফুল ফুটে সুগন্ধ ছড়ায় সেই সুগন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে যায় কীটপতঙ্গরা। মহুয়া ফুলের সন্ধে ভালুকরা আকৃষ্ট হয়। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে উল্লেখ করা হয়েছে বনে নাগলিঙ্গম ফুল ফুটলে তার উগ্র গন্ধে মাতাল হয়ে উঠে হাতিরা।

মানুষতো উন্নত প্রাণী। সুগন্ধের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াটাই স্বাভাবিক এবং প্রথম থেকেই হাতের কাছে সুগন্ধি দ্রব্যকে মজুত করতে চেয়েছিল। আগুন আবিষ্কার হওয়ার পরে বিশেষ বিশেষ গাছের কাঠ, আঠা, পাতা ইত্যাদিকে পুড়িয়ে সুগন্ধযুক্ত ধোঁয়ার সৃষ্টি করতো এবং "সুগন্ধি" শব্দটাই এই প্রক্রিয়াটিকে নির্দেশ করে। সুগন্ধিকে ইংরেজীতে বলে Perfume। ল্যাটিন fumus শব্দটি থেকে এসেছে Perfume। ল্যাটিন fumus শব্দের অর্থই হচ্ছে ধোঁয়া। গন্ধযুক্ত ধোঁয়া আজ থেকে কম করে পাঁচ হাজার বছর আগে মিশরীয়রা উৎপাদন করতেন।

তরল সুগন্ধি হিসেবে মানুষ প্রথম ব্যবহার করেছিল গোলাপজলকে। কথিত আছে, খ্রীস্টীয় সপ্তম কিংবা অষ্টম শতাব্দীর দিকে প্রথম আরবীয়রাই তৈরি

করেছিলেন গোলাপজল। পদ্ধতিটি অতি সাধারণ। গোলাপ ফুলের পাপড়ি সংগ্রহ করতেন। জলে প্রচুর গোলাপের পাপড়ি ফেলে পাতন প্রক্রিয়ার সাহায্যে তৈরি করতেন গোলাপজল। সেকালে শুধু সুগন্ধি হিসেবে গোলাপজল ব্যবহার করা হতো না। ওষুধেও প্রয়োগ করা হতো। ঐ গোলাপজল আজও আমাদের কাছে বেশ প্রিয়।

গোলাপের আতর তৈরিও আরবীয়দের অবদান। কথিত আছে, সেদিন গোলাপের আতর তৈরির জন্য প্রচুর গোলাপ চাষ করা হতো। খরচও পড়তো প্রচুর। এক হেক্টর জমিতে গোলাপ চাষ করলে পাওয়া যেতো ২ টনের মত গোলাপের পাপড়ি। ঐ পরিমাণ পাপড়ি থেকে পাওয়া যেত মাত্র এক কিলোগ্রামের মত আতর। সেই আতর ব্যবহার করতেন রাজরাজড়ারা। তাঁরাই আতর তৈরির জন্য গোলাপ চাষের ব্যবস্থা করতেন। বেগম নূরজাহানের জন্য আতর তৈরি করা হতো কাশ্মীরে গোলাপ চাষ করে।

গোলাপের পরে অন্যান্য সুগন্ধি ফুল থেকেও শুরু হয় আতর তৈরি করা। তাদের মধ্যে জুঁই, লেবুর ফুল ইত্যাদি অন্যতম। শুধু ফুল থেকে নয়, সে আমলে চন্দন গাছ থেকেও সুগন্ধি চন্দন তেল সংগ্রহ করা হতো। চন্দন কাঠেরও চাহিদা ছিল। তাছাড়া ল্যাভেন্ডার, পিপারমেন্ট প্রভৃতি গাছের পাতা থেকেও সুগন্ধি সংগ্রহ করা হতো। কিন্তু সব পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত খরচাবহুল। তাই দাম ছিল প্রচুর। সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার একেবারে বাহিরে।

সর্বক্ষেত্রেই সাহায্য গ্রহণ করা হতো পাতন প্রক্রিয়ার। এখনও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচলন আছে। যেমন চন্দন কাঠ থেকে চন্দন তেল তৈরি করতে হলে সাহায্য গ্রহণ করতে হয় পাতন প্রক্রিয়ার। চন্দন কাঠকে প্রথমে কেটে টুকরো টুকরো করা হয়। তারপর কয়েকদিন জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। তারপর কাঠকে পাতিত করলেই তেল পাওয়া যায়। তবে এও সত্য, সেকালে কাঠ থেকে সুগন্ধি তেল সংগ্রহ যত সহজ ছিল, ফুল থেকে আতর সংগ্রহ তত সহজ ছিল না।

বর্তমানে রসায়নবিজ্ঞানের কৃপায় সুগন্ধি পদার্থ অত্যন্ত সুলভ হয়েছে। ফুল থেকে আর সুগন্ধি সংগ্রহ করতে হয় না। সম্পূর্ণ কৃত্রিম উপায়েই রসায়নাগারে বসে সুগন্ধি তৈরি করা যায়।

রুটি ও পাউরুটি

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের খাদ্যতালিকা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। কারও খাদ্যতালিকায় প্রোটিনের ছড়াছড়ি, কারও অল্প পরিমাণ। অন্যদিকে কেউ কেউ আবার নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করেন। খাদ্যশস্যও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন। চাল, গম, ভুট্টা, যব, জোয়ার ইত্যাদি যে দেশে যে ফসল জন্মায় সে দেশে সেই শস্যই প্রধান

খাদ্য। কিন্তু আটা বা ময়দার রুটি ও পাউরুটি পৃথিবীর সব জায়গায় সমানভাবে আদৃত। কারও কারও খাদ্যতালিকায় আবার রুটি প্রধান স্থান অধিকার করে আছে।

মানুষ প্রথম কৃষিকাজ শুরু করলে গম ও যবের চাষই শুরু করেছিল। সেদিন উপত্যকায় উপত্যকায় এমের, ডিনকেল প্রভৃতি ঘাস জন্মাতো। গম ও যবের পূর্বপুরুষ ঐসব ঘাসের বীজ। সে আমলে উৎপন্ন ফসলকে চিবিয়ে বা সেদ্ধ করে খেতো। অনেক পরে গম ও যবকে ভাঙার জন্য জাঁতা আবিষ্কৃত হয় এবং তারপরে মিশরীয়দের আমলে রুটি তৈরির প্রচলন হয়।

সেকালে মিশর কৃষিকাজে যথেষ্ট উন্নত ছিল। তারা প্রচুর পরিমাণে গম উৎপাদন করতো এবং গমই ছিল তাদের প্রধান খাদ্যশস্য। ব্যবহার করতো গুঁড়ো গম। গুঁড়ো গমে জল দিয়ে একটা তাল পাকাতো। তারপর তাল থেকে ছোট ছোট টুকরো করে হাতে চ্যাপ্টা করে পিঠের মত জিনিস তৈরি করতো। বেশ মোটামোটা ছিল এবং সেগুলোকে উনানের উপর মাটির পাত্রে অল্প অল্প তাপে সেদ্ধ করে নিতো। এইটেই রুটি তৈরির প্রথম পদ্ধতি এবং এখনও কোথাও কোথাও এই পদ্ধতিতে রুটি তৈরি হয়। চাকি ও বেলন দিয়ে রুটিকে পাতলা করার পদ্ধতি পরের আবিষ্কার।

পাউরুটি তৈরির পদ্ধতিও মিশরীয়দের আবিষ্কার। পাউরুটি তৈরি করতে হলে ঈস্ট বা খমির মেশাতে হয়। ঈস্ট এককোষী ছত্রাক জাতীয় অতি সূক্ষ্ম উদ্ভিদ। এর মধ্যে এনজাইম নামের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রাসায়নিক পদার্থ থাকে এবং ঐ এনজাইমই বিক্রিয়া ঘটায়।

ঈস্টের সঙ্গে মানুষের পরিচয় বহুকাল আগেই হয়েছিল। সেই প্রাচীনকালেও ফলের রসকে গাঁজাতে খমির ব্যবহার করতো। যদিও সেই খমির বা ঈস্ট আজকের মত উন্নত ছিল না। ময়দা মাখিয়ে ঈস্টযুক্ত করে সেঁকতে গিয়েই আবিষ্কার করেছিল পাউরুটি তৈরির পদ্ধতি। কেননা, ময়দার সঙ্গে ঈস্ট মেশালে ময়দার কার্বোহাইড্রেটের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু হয় এবং ময়দা গেঁজে উঠে। তাপ প্রয়োগের ফলে উৎপন্ন কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্যাস যতই উৎপন্ন হয় ততই রুটি ফুলে ফেঁপে উঠে। অনুরূপ পদ্ধতি এখনও চলে আসছে। গেঁজে ওঠাকে বলে সন্ধানক্রিয়া। ইংরেজিতে বলা হয় ফার্মেন্টেশন। শব্দটি ল্যাটিন ফারভিয়ার শব্দ থেকে নেওয়া। শব্দটির অর্থ ফুলে ওঠা।

পাউরুটি প্রসঙ্গে অনেকের কেক তৈরির কথাও মনে আসতে পারে। সম্ভবত প্রথম রোমানরাই কেক তৈরি করেছিল। তারা ছিল ভারি ভোজনরসিক। নতুন নতুন খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুতের জন্য ধনীরা লোক নিয়োগ করতেন। প্রথম কেক অবশ্য বিবাহে উপস্থিত অতিথিদের আপ্যায়িত করার জন্য পরিবেশন করা হতো। সে কেক আয়তনে বেশ বড় বড় করা হতো। একটা সংস্কারও গড়ে উঠেছিল। বিবাহ অনুষ্ঠানে

কেক পরিবেশন করলে দাম্পত্যজীবন সুখের হয়। পরে বিবাহের আসর ছেড়ে কেক ধনীদের রান্নাঘরে প্রবেশ করে।

সেদিন মিশরীয়রা কিন্তু আজকের মত এত সুন্দর ও সুস্বাদু পাউরুটি তৈরি করতে পারতো না। যে ঈস্ট বা খমির ব্যবহার করতো তার গুণগত মান নিতান্তই নিকৃষ্ট শ্রেণীর ছিল। মিশরীয়দের পরে হিব্রুরা কিছুটা উন্নত ধরনের খমির ব্যবহার করেছিল এবং পাউরুটির মানকেও কিছুটা উন্নত করেছিল। পরে আরও উন্নত করেছিল ইহুদীরা।

আজও পাউরুটি তৈরি করতে হলে প্রথমে ময়দাকে গাঁজাতে হয়। বর্তমানে যে ঈস্ট ব্যবহার করা হয় তার এনজাইমগুলোর মধ্যে নাইট্রোজেন ঘটিত জৈব যৌগ জাইমেজ অন্যতম। জাইমেজ ছাড়া ঈস্টকোষে ইনভারটেজ, মলটেজ প্রভৃতি এনজাইমও থাকে। এরাই অনুঘটকের কাজ করে এবং সন্ধানক্রিয়া সম্পন্ন করে। বর্তমানে পাউরুটি এবং কেক তৈরি করতে ব্যবহার করা হয় বেকিং পাউডার। বেকিং পাউডার সোডিয়াম বাই কার্বনেট এবং টাটারিক অ্যাসিডের মিশ্রণ। জল দিয়ে ময়দাকে মাখার সময় বেকিং পাউডারকে প্রয়োগ করা হয় এবং পাউরুটিকে সেঁকলে প্রচুর পরিমাণে কার্বন-ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয়। বুদবুদের আকারে ঐ গ্যাস নরম ময়দার লেচিকে ফাঁপিয়ে তোলে এবং ছিদ্রবহুলও হয়। গ্যাসটি বাতাস অপেক্ষা ভারি বলেই সম্ভব হয়।

আইসক্রিম

আইসক্রিম খেতে কে না ভালবাসেন! বিশেষ করে ছোটরা। আইসক্রিমের নাম শুনলে তাদের জিভ থেকে যেন জল গড়িয়ে পড়ে। পয়সা হাতে ফেরিওয়ালার পেছু নেয়। আইসক্রিম নানা ধরনের। শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই এর রমরমা। আইসক্রিম হাতে এলে অনেকেরই মনে হয়, এমন একটি সুন্দর জিনিস প্রথম কে বা কারা উপহার দিয়েছিল?

আইসক্রিম কিন্তু আজকের আবিষ্কার নয়। যদিও বর্তমানে ওর মানের অনেক উন্নতি হয়েছে, তবু এর আবিষ্কার বহু আগেই হয়েছিল। মার্কোপোলোর ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে জানা গেছে, প্রাচ্যই প্রথম আইসক্রিম তৈরি করেছিল। মার্কোপোলো দীর্ঘকাল প্রাচ্যের দেশগুলোতে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন এবং প্রাচ্য সম্বন্ধে বহু তথ্য পাশ্চাত্যে সরবরাহ করেছিলেন। তিনি বন্ধুদেরও বলতেন, আইসক্রিম খেতে কিন্তু বেশ। প্রাচ্যের অনেকে দেশে মানুষ বরফের তৈরি আইসক্রিম খেতে খুবই ভালবাসে। তিনি নিজেও খেয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু কীভাবে যে প্রাচ্যে আইসক্রিম তৈরি

হতো সে বিষয়ে তিনি কোন মন্তব্য করেননি।

মার্কোপোলোর কথায় প্রথম ইতালিই আইসক্রিম তৈরি করার উৎসাহ বোধ করে। তৈরিও করেছিল। কিন্তু কতখানি কৃতিত্ব অর্জন করেছিল সে বিষয়ে কিছু জানা যায় না। পদ্ধতিটিও অজানা। তবে ইতালির তৈরি আইসক্রিম ফ্রান্সকে মুগ্ধ করেছিল এবং তাদের তৈরি আইসক্রিম বেশ সুখ্যাতিও অর্জন করেছিল। তবে এর ব্যবহার একমাত্র ফ্রান্সের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ।

ফ্রান্সে যারা প্রথম আইসক্রিম তৈরি শুরু করেছিল তারা ব্যবসায়ী। ঐ কারণে ব্যবসায়ীবা গোপনীয়তা রক্ষা করেছিল এবং বেশ দু পয়সা কামিয়ে নিয়েছিল। তাদের তৈরি আইসক্রিমের মান উন্নত হওয়ায় ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই খেতো এবং অতি অল্পকালের মধ্যে আইসক্রিম সুস্বাদু ও তৃপ্তিকর হিসেবে দেশের সর্বত্র সুনাম অর্জন করেছিল।

আইসক্রিম তৈরির গোপনীয়তা ফ্রান্স কিন্তু বেশি দিন বজায় রাখতে পারেনি। অন্যান্য দেশও কৌশলে ফ্রান্সের কাছ থেকে আইসক্রিম তৈরি শিখে নেয় এবং নিজ নিজ দেশে ঢালাওভাবে ব্যবসা শুরু করে। সবদেশের কাছেই প্রিয় হয়ে উঠে আইসক্রিম। তখনই বিভিন্ন দেশে আইসক্রিম সরবরাহের জন্য বাল্টিমোরে একটা বাণিজ্যিক সংস্থা গঠিত হয়। তারা আইসক্রিমকে আরও জনপ্রিয় করার জন্য গবেষকও নিযুক্ত করে এবং প্রথম উৎপাদন করে ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত হিমায়কযন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি। সেই কারণে আইসক্রিম তৈরি বেশ কষ্টসাধ্যই ছিল। দামও ছিল আজকের অনুপাতে অনেক বেশি।

রেফ্রিজারেটার আবিষ্কৃত হওয়ার পরই আইসক্রিম সুলভ হয়েছে। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দ থেকেই শুরু হয়েছে আইসক্রিমের নতুন যুগ। ঐ সময় থেকেই পৃথিবীর প্রায় সমূহ দেশ আইসক্রিম তৈরি শুরু করে।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্তও আইসক্রিমকে কেবল গ্রীষ্মকালেই খাওয়া হতো। বর্তমানে এর গুণগতমান এতখানি বাড়ানো হয়েছে যে, বছরের যেকোন ঋতুতে এমনকি শীতকালেও মানুষ আইসক্রিম খায়। বিভিন্ন পুষ্টিকর উপাদান যোগ করার ফলে এটি একটি উন্নত খাদ্যের পর্যায়েও পড়ে। কী থাকেনা ওতে! দুধের সর, দুধ, চিনি, বাদাম, ফলের রস এমনকি কোন কোন আইসক্রিমে ডিমও মেশানো হয়। সুগন্ধির জন্য প্রয়োগ করা হয় ভ্যানিলা, চকোলেট, বেরি, ফলের রস ইত্যাদি। এতে শতকরা ৮৫ ভাগই থাকে দুধ ও দুধ জাতীয় উপাদান এবং ১৫ ভাগের মত চিনি। সুগন্ধির পরিমাণ নিতান্ত অল্প। সুস্থিত অবস্থায় রাখার জন্য এবং বরফের ছোট ছোট টুকরা যাতে জমতে না পারে তার জন্য বিশুদ্ধ জিলাটিন স্টেবিলাইজার

হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বিশুদ্ধ জিলাটিনকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করলে ক্ষতি হয় না।

উপরোক্ত উপাদানগুলো থাকার জন্য আইসক্রিম একদিকে যেমন পুষ্টিকর, অপরদিকে তেমনই রসনা তৃপ্তিকর, ক্যালসিয়াম, প্রোটিন এবং ভিটামিন বি সমৃদ্ধ। কিছু ভিটামিন এ-ও থাকে। ধীরে ধীরে এর ব্যবহার বেড়েই চলেছে।

প্রদীপ ও মোমবাতি

মানুষ যতদিন পর্যন্ত আগুনের সন্ধান পায়নি ততদিন পর্যন্ত একমাত্র সূর্যের আলোই ছিল তাদের ভরসা। রাতে পশুপাখিদের মত অন্ধকারেই কাটাতে হতো। নিশ্চিন্তে ঘুমানোরও উপায় ছিল না। গুহাবাসের সময় কিছুটা নিরাপত্তা এলেও একেবারে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারেই রাত কাটাতে হতো। সূর্যাস্তের অনেক আগেই ফিরে আসতে হতো আস্তানায় এবং পরের দিনের সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষায় থাকতে হতো। রাত্রিটা তাদের কাছে যেমন ছিল ভয়ঙ্কর তেমনই বীভৎসও। মাঝে মাঝে হিংস্র জন্তু মানুষের ডেরায় হানা দিতো।

আগুন জ্বালাতে শেখার পরই মানুষের দুরবস্থার কিছুটা অবসান হয়। গুহার মুখে হিংস্র জন্তুদের প্রতিহত করতে কেবল আগুন জ্বালিয়ে রাখল না। বড় বড় চেলা কাঠ জ্বেলে গুহার ভেতরে অন্ধকারকেও দূর করেছিল। তবে সব ধরনের শুকনো কাঠ ব্যবহার করতো না। সেসব কাঠ দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে সেইসব কাঠই সংগ্রহ করে আনতো। এর জন্য তাদের অনেক গবেষণা এবং অনেক পরীক্ষাও করতে হয়েছিল। আবিষ্কার করেছিল আঠাযুক্ত কাঠ এবং শুকনো হালকা কাঠই এই কাজে উপযুক্ত। গুহাগাত্রে যখন ছবি আঁকতো তখন একজন এই জাতীয় একটা কাঠের ফালিকে জ্বালিয়ে চিত্রকরের সামনে ধরতো। কেরোসিন হাতে পাওয়ার পূর্বপর্যন্তও এই ধারা অনেকাংশে বজায় ছিল বলা যায়। আমাদের দেশে রাতে নারকেলপাতা, পাটকাঠি ইত্যাদি জ্বালিয়ে কেউ কেউ কাজ করতেন।

পণ্ডিতদের মতে গুহামানবের ঐ কাঠের দণ্ড বা ফালিই বাতির আদিরূপ। তারপরেই ওরা পশুর চর্বিকে কাজে লাগিয়েছিল। কোন কোন দেশের আদিম অধিবাসীরা এখনও রাতে পশুচর্বিকে জ্বালিয়ে কাজকর্ম করে। তবে বিদ্যুতের কৃপায় পুরাতন পদ্ধতিগুলির অধিকাংশ পরিত্যক্ত হয়েছে। সেদিনের মানুষ প্রধানতঃ শামুকের খোলকেই চর্বি রাখতো এবং পরিবেশের কোন কোন গাছের বাকল থেকে তন্তু সংগ্রহ করতো। একগুচ্ছ তন্তু গুঁজে দিত শামুকের খোলে রাখা চর্বির উপায়। তারপর অগ্নি সংযোগ করতো। এইটিই প্রদীপের আদিমরূপ।

পদ্ধতিটি আবিষ্কারের মূলে পণ্ডিতেরা ওদের বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিকার করা পশুকে অগ্নিদগ্ধ করানোর জন্য তারা আগুনের উপর ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছিল। তখনই লক্ষ্য করেছিল পশুর গায়ের চর্বি গলে গিয়ে ফোঁটা ফোঁটা পড়তো আগুনের মধ্যে এবং পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দাউ দাউ করে উঠতো আগুন। আগুনের মধ্যে পাথরের ফলকেই ঝুলিয়ে রাখতো পশুমাংসকে।

চর্বির প্রদীপের পরেই শুরু হয় মোমবাতি তৈরি। আদিম মানুষ প্রথম চর্বি দিয়েই মোমবাতি তৈরি করেছিল। চর্বিকে গরম করলে গলে যায় এবং ঠান্ডা হলে শক্ত হয়ে উঠে। শক্ত অবস্থায় বেশ নরমও। লম্বা নলের আকার হাতে হাতেই দেওয়া যায়। বুদ্ধি করে সলিতা পরিয়ে চর্বি দিয়েই মোমবাতি তৈরি করেছিল এবং অনেককাল ধরে চলে আসছিল অন্ধকার দূরীকরণের উপরোক্ত উপায়গুলি। তথা কাঠের চেলা, চর্বির প্রদীপ ও চর্বি দিয়ে তৈরি বাতি।

মানুষ মোমের সন্ধান পেয়েছে আরও পরে। সেকালে বনে বাদাড়ে মৌমাছিরা প্রচুর মৌচাক বানাতো। বেশ বড় বড় চাক। অনুসন্ধিৎসু মানুষ মৌচাক পেড়েছিল এবং মধুও খেয়েছিল। আগুনেও পুড়িয়েছিল চাককে। সেই সময়ই তারা পেয়েছিল মোমের সন্ধান। পশুর চর্বি অপেক্ষা মোম অনেক উন্নত এবং মোম পোড়ালে চর্বির মত দুর্গন্ধ ছড়ায় না। তাই অনেকেই মোমবাতি তৈরির প্রতি আকর্ষণবোধ করে। তখন মৌচাকের মোম বেশ সহজলভ্যই ছিল এবং রাতে বড় বড় অনুষ্ঠানেও প্রচুর সংখ্যক মোমবাতি জ্বালানো হতো। সরু ও মোটা উভয় ধরনের মোমবাতি। মোমবাতি জ্বালানোকে কেন্দ্র করে একসময় ঝাড়লণ্ঠনেরও উদ্ভব হয়েছিল। কাঁচের তৈরি এক একটা গেলাসের মধ্যে মোমবাতি বসানো হতো। এক একটা ঝাড়ে বিশ পঁচিশটি করে মোমবাতি বসানো থাকতো। কাচের তৈরি ঐ লণ্ঠন বেশ সুদৃশ্যও ছিল। আজও কোথাও কোথাও দেখা যায়।

মোমবাতির পাশাপাশি চলেছিল প্রদীপের উন্নতিসাধন এবং দাহ্য তেলের সন্ধান। মানুষ আবিস্কার করেছিল কোন কোন গাছের বীজকে পেষালে তেল পাওয়া যায় এবং এই তেলকে প্রদীপে পুরে জ্বালানো যায়। বেশ বড় বড় প্রদীপ তৈরি হয়েছিল এব` প্রতি প্রদীপে অনেকখানি তেল রাখা যেতো। মোটা সলতেও দেওয়া হতো। শিখা বেশ উজ্জ্বলই হতো। ঐ উদ্ভিজ্জ তেলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে লাঠির ডগায় জড়িয়ে মশালও তৈরি করতো। রাত-বিরেতে বেরুতে হলে ঐ মশালই ছিল একমাত্র সম্বল। লুঠেরারা মশাল জ্বালিয়ে ধনীর বাড়িতে রাতে হানা দিতো।

ঐ পদ্ধতি একরকম ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত চলে এসেছিল। তারপরেই মানুষ খনিজ তেলের সন্ধান লাভ করে। তখনই আলো জ্বালানোর ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা হয়। খনিজ তেলের সাহায্যে প্রথম আলো জ্বালিয়েছিলেন ১৮২০

খ্রীস্টাব্দে লার্ড নামে এক ভদ্রলোক। এর পরেই আবিষ্কৃত হয় নানা ধরনের কেরোসিনের বাতি—লণ্ঠন থেকে পেট্রোমাক্স। মোমবাতি তৈরির বেলায়ও ব্যবহৃত হতে শুরু করে প্যারাফিন।

তারপর শুরু হয় কয়লার গ্যাসের যুগ। কোল গ্যাসের সাহায্যে প্রথম আলোক উৎপাদন করেছিলেন উইলিয়ম মার্ডক। তারপরেই শুরু হয় বিদ্যুতের বাতি। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে এডিসন এবং সোয়ান নামে দুজন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন বৈদ্যুতিক বাল্‌ব। আজ আমরা বিদ্যুতের যুগে বাস করছি। মহানিশার ঘনান্ধকার আমাদের বিব্রত করে না। কিন্তু সহস্র সহস্র বছর ধরে মানুষ অন্ধকারেই অভ্যস্ত ছিল। সে এক চরম দুঃসময়। বর্তমানে সেই চরম দুরবস্থার কথা আমরা কল্পনায়ও স্থান দিতে পারবো না।

চুম্বক ও নৌকম্পাস

চুম্বকের সঙ্গে মানুষের পরিচয় হয়েছিল অতি প্রাচীনকালে। সম্ভবতঃ খ্রীস্টজন্মের দু'হাজার বছর আগে। এশিয়া মাইনর অঞ্চলের অধিবাসীরা দেখতেন, এক ধরনের কালো কালো পাথরকে। পাথরগুলোর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যও তাঁরা লক্ষ্য করতেন। যেখানেই ঐ পাথর পড়ে থাকতো সেইখানের পাথরের গায়ে লেপ্টে থাকতো লোহাব টুকরো।

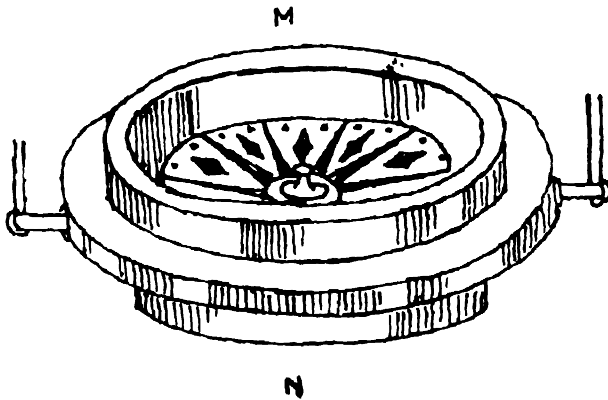
কেউ হয়ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন পাথরকে। লক্ষ্য করেছিলেন, ঐ পাথর লোহাকে আকর্ষণ করতে পারে। মাঝখানে সুতো দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখলে একটা মুখ সবসময় উত্তরদিকেই থাকে। সেই মুখটাকে ঘুরিয়ে দক্ষিণে আনলেও আপনা হতেই ঘুরে যায় সেই উত্তরের দিকে এবং ঝুলতে থাকে উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত অবস্থায়।

ঐ পাথরই স্বাভাবিক চুম্বক এবং প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। ওর বৈশিষ্ট্যগুলো আবিষ্কার করতে অবশ্যই সময় লেগেছিল। কে বা কারা যে আবিষ্কার করেছিলেন সে বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। সেদিন ওকে বিশ্লেষণও করা হয়নি। বিশ্লেষণ করা হয়েছে অনেক পরে—একেবারে আধুনিককালে। জানা গেছে প্রকৃতিতে প্রাপ্ত ঐ স্বাভাবিক চুম্বক লোহা এবং অক্সিজেনের যৌগিক (Fe_3O_4)। ফেরোসোফেরিক অক্সাইড। লোহার ভাগ প্রায় ৭২ শতাংশ এবং বাকিটা অক্সিজেন। এশিয়া মাইনরের ম্যাগনেসিয়া অঞ্চলে ওদের প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়েছিল বলে নামকরণ করা হয়েছে ম্যাগনেটাইট।

সুতোয় বেঁধে ঝুলিয়ে রাখলে একটা মুখ সবসময় উত্তরদিকে থাকে বলে কোনও

বুদ্ধিমান ব্যক্তি ওকে দিক্‌নির্ণয়ের কাজে নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। সফলও হয়েছিলেন এবং সেই থেকে দিক্‌নির্ণয়ের কাজেই ব্যবহার চালু হয়েছিল। ঐ কারণে পাথরটির নামকরণ হয়েছিল লোডস্টোন বা পথপ্রদর্শনকারী পাথর।

সেদিনের বড় বড় পালতোলা জাহাজে যাঁরা সমুদ্রে যাতায়াত করতেন তাঁদের রাতে দিক্‌নির্ণয়ের ভারি অসুবিধা হতো। বিশেষ করে আকাশ মেঘলা থাকলে। তাই দিক্‌নির্ণয়ের জন্য তাঁরা লুফে নিলেন পাথরটাকে এবং শুরু করলেন ব্যবহার। খ্রীস্টজন্মের অনেক আগেই ওর ব্যবহার শুরু হয়েছিল বলে পণ্ডিতদের অভিমত।



আজকের দিনেও সেই একই কাজে নাবিকরা ব্যবহার করে আসছেন। তবে সরাসরি সেই পাথরকে নয়, চুম্বক দিয়ে তৈরি একটি যন্ত্র। যন্ত্রটির নাম ম্যারিনার কম্পাস বা নৌকম্পাস। এর প্রধান উপকরণ একটি সূচীচুম্বক। দীর্ঘকালের ব্যবধানে কম্পাসের অনেক উন্নতি হয়েছে। যন্ত্রটি এমনকিছু জটিল নয়। একটা গোলাকার চাকতিতে একটা সূচীচুম্বক আটকানো থাকে। চাকতিটার পরিধি ব্যাসার্ধ বরাবর ৩২টি সমানভাবে ভাগ করা থাকে। প্রতি ভাগের জন্য এক একটা দাগ কাটা। দাগগুলোকে বলা হয় কম্পাসবিন্দু এবং প্রতিটি ভাগ বিশেষ এক একটা দিক্ নির্দেশ করে। যন্ত্রের মূল উপাদান সূচীচুম্বকটা উত্তর দক্ষিণে প্রলম্বিত থাকে এবং এই দুটি দিককেও চাকতিতে চিহ্নিত করা হয়। উত্তর দিকটা চিহ্নিত করা হয় মুকুট ছাপ দিয়ে।

চাকতিসহ সূচীচুম্বকটা একটা অর্ধচন্দ্রাকার পাত্রের মধ্যে উল্লম্ব সূচীশীর্ষে (Pivot) অনুভূমিকভাবে রাখা হয়। জাহাজ যেহেতু সমুদ্রে দোল খায় এবং দোলনের ফলে সূচীচুম্বকটা সর্বদা স্থিরভাবে থাকতে পারে না। তাই বিশেষ কৌশলের মাধ্যমে পাত্রটিকে একটা আংটার দুই বিপরীত বিন্দুতে (চিত্রে M.N) ঝোলানো অবস্থায়

রাখা হয়। ফলে জাহাজ দুলতে থাকলেও সূচীচুম্বকটা অবাধে সবসময় একই অবস্থায় তথা উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত থাকে।

প্রাথমিক কম্পাস কিন্তু আদৌ উন্নত ছিল না। শুধু একটা সূচীচুম্বককে ঝুলিয়ে রাখা হতো। প্রাথমিক এই কম্পাসের আবিষ্কর্তা চীনদেশ। চীনারা দাবি করেছেন, তাঁদের এই আবিষ্কার খ্রীস্টজন্মের আড়াই হাজার বছর পূর্বে হয়েছিল। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা নৌকম্পাসের আবিষ্কার এত প্রাচীন বলে মনে করেন না। তাই বিতর্ক আছে যথেষ্ট। তবে সবাই একমত যে, প্রাচীনকালে সত্যসত্যই চীনদেশ নৌকম্পাস আবিষ্কাব করেছিল।

চীনাদের কাছ থেকে মধ্যযুগে প্রথম আরবীয়রাই নৌকম্পাস তৈরির কৌশল শিখেছিলেন। অনেকের মতে খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে। ঐ সময় আরবীয়রা জ্ঞানবিজ্ঞানে যথেষ্ট উন্নতি করেছিলেন এবং বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো সংগ্রহ করেছিলেন। এ-বিষয়ে তাঁরা গবেষণাও চালাতেন। কথিত আছে, ভারতীয় গণিত ও আয়ুর্বেদশাস্ত্রকে নিয়ে নতুনভাবে গবেষণা করেছিলেন এবং প্রতিবেশী চীনদেশ থেকেও সংগ্রহ করেছিলেন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি। অপরদিকে সে সময় আববীয় বণিকরা জলপথে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্য চালাতেন। ফলে চীনাদের তৈরি নৌকম্পাস তাঁদের কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। ঐ আরবীয় বণিকদের কাছ থেকেই নৌকম্পাসের ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে ইওরোপীয় বণিকদের মধ্যে। আরবীয় বণিকদের হাতে পড়ে নৌকম্পাস কিছুটা উন্নত হয়েছিল এবং একে আরও উন্নত করার জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু প্রতিভা নিয়োজিত হয়েছিল। অবশ্য ত্রুটি ছিল তখনও।



সেদিনের নাবিকদের ব্যবহৃত কম্পাস ছিল অতি সাধারণ। একটা কাঠের টুকরোর উপর সূচীচুম্বক রেখে ওদের একটা জলপূর্ণ পাত্রে স্থাপন করা হতো।

ইওরোপীয় বণিকরাই জলপূর্ণ পাত্রের তলদেশ থেকে একটা পিনের সাহায্যে সূচীচুম্বককে উল্লম্ব সূচীশীর্ষে অনুভূমিক অবস্থায় রাখার ব্যবস্থা করেন।

ভৌগোলিক আবিষ্কারের যুগে ঐ কম্পাসকে নিয়ে অনেক গোলযোগ দেখা দিয়েছিল। বর্তমানে আমরা জানি চৌম্বক উত্তর মেরু এবং ভৌগোলিক উত্তর মেরু উভয়ের অবস্থান একটি বিন্দুতে নয়। চৌম্বক উত্তর মেরু ভৌগোলিক উত্তর মেরু থেকে ১৫০০ মাইল পশ্চিমে উত্তর আমেরিকার কানাডার Boothia উপদ্বীপ (৭০°৭৫° উত্তরক অক্ষাংশে এবং ৯০° পশ্চিম দ্রাঘিমাংশে)। সমস্ত কম্পাসের সূচীমুখের উত্তর মেরু ঐ দিকটাকেই নির্দেশ করে। এই সত্যটি সেদিন নাবিকদের জানা না থাকায় উত্তর মেরুর দিকে যাঁরা অভিযান চালিয়েছিলেন তাঁরা অসুবিধায় পড়েছিলেন। বহু দুর্ঘটনাও ঘটেছিল। বিভ্রান্ত হতে হয়েছিল সবাইকে।

পরে পৃথিবীর সমূহ স্থলভাগের ও জলভাগের চার্ট ও মানচিত্র তৈরি হলেই সব তথ্য পরিষ্কার হয়ে উঠে।

চিনি, মিষ্টি, মধুচিনি

মিষ্টি খেতে সবাই ভালবাসেন। ছোটদের তো কথাই নেই! টফি, লজঞ্জুস থেকে বাজারে থরেথরে সাজানো হরেক রকমের মিষ্টি দেখলে চোখদুটো গোল গোল হয়ে উঠে। কিন্তু যেকোন ধরনের মিষ্টি হোক না কেন, তার প্রধান উপাদান চিনি। মুখরোচক ও সুগন্ধযুক্ত করতে মেশানো হয় ছানা, ময়দা, সুজী এবং কোন সুগন্ধি দ্রব্য। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ আবার মিষ্টি তৈরির ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বকীয়তা অবলম্বন করে এবং বাংলার মিষ্টির সুনাম জগৎজোড়া।

অনেকেরই মনে প্রশ্ন আসছে মিষ্টি প্রথম কোথায় তৈরি হয়েছিল? কে বা কারা তৈরি করেছিল মিষ্টি? না, বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি তৈরি খুব বেশি পুরনো নয়। তবে মিষ্টির প্রধান উপকরণ যে চিনি—সেটির আবিষ্কার কিন্তু বহু পুরনো।

আদিকালের মানুষেরও মিষ্টদ্রব্যের প্রতি লোভ ছিল। কিন্তু মিষ্টি কিংবা চিনি কোনকিছু তারা নিজ হাতে তৈরি করতে পারতো না বা সে মানসিকতাও ছিল না তাদের। লুফে নিতো গাছের মিষ্টি মিষ্টি ফল, গাছের মিষ্টি শেকড় কিংবা কন্দ। বনে বনে ঘুরে বেড়াতো বলে এবং একমাত্র খাদ্য অন্বেষণ তাদের কাজ ছিল বলে এমন বহু গাছের তারা সন্ধান লাভ করেছিল। সত্য বলতে কী গাছগাছড়ার প্রকৃতি ও গুণাগুণ আবিষ্কার সেইকালের ঘটনা। নদীর তীরভূমিতে নলখাগড়া জাতীয় যেসব তৃণ জন্মাত তাদেরও চিবিয়ে পরখ করেছিল। কোন কোনটি চিবিয়ে রস খেতে বেশ ভালই লাগত। এই উপায়ে একদিন সন্ধান পেয়েছিল আখের মত তৃণজাতীয়

উদ্ভিদ। আর বন্যজীবনে লাভ করেছিল মৌচাকের মধু। মধু আবিষ্কার ও তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার ফল এবং মধু ছিল তাদের অত্যন্ত প্রিয়। প্রাচীন মিষ্টদ্রব্য বলতে একমাত্র মধুকেই বলতে হবে।

নগর সভ্যতার পত্তন হলে মধুর ব্যাপক চাহিদা হয়েছিল। শুধু মিষ্টি হিসেবে নয়, ওষুধরূপেও মধুর ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিল। প্রাচীন সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, মিশরীয় ও সিন্ধুসভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে মিষ্টি তৈরির কোন নিদর্শন অবশ্য লাভ করা যায়নি। তবে প্রাচীনকালে আঁকা কতকগুলো ছবি পাওয়া গেছে। ঐ ছবিগুলো বিশ্লেষণ করে পণ্ডিতেরা স্থির করেছেন, সেকালেও মিষ্টদ্রব্য মিশরীয়রা ভারি পছন্দ করতো। কিছু কিছু নমুনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, মিশরীয়রা মিষ্টি পছন্দ করলেও চিনির ব্যবহার জানতো না বা আখের রস প্রভৃতি থেকে চিনি তৈরি তাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। সম্ভবত তাঁরা কেবল মধু প্রয়োগ করে মিষ্টি বানাতো। প্রধানত খেজুরকে মধুতে ডুবিয়ে রেখে মিষ্টি বানাতো এবং এই মিষ্টি তাদের খুব প্রিয় ছিল। এমনও মনে করা হয়, মিশরীয়রা মৃত রাজাদের দেহকে মমিতে পরিণত করতে গিয়ে প্রয়োগ করতো অন্যান্য সামগ্রীর সঙ্গে মধুও। প্রাচীন ভারতের কাছেও মধু অজ্ঞাত ছিল না। ভারত মধুকে অত্যন্ত উপাদেয় সামগ্রী হিসেবে গণ্য করতো এবং ওষুধেও মধুকে প্রয়োগ করতো।

এখানে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় যে, মৌচাকে মৌমাছিদের দ্বারা সঞ্চিত মধু পুরোপুরি পুষ্পমধু নয়। ফুলেব মধু এবং মৌমাছিদের মুখনিঃসৃত লালা একত্রিত হয়ে এক ধরনের মিশ্রণ তৈরি হয় এবং ঐ মিশ্রণটিই মৌচাকের মধু। তবে ভিন্ন ভিন্ন জাতের ফুল থেকে মৌমাছিদের সংগ্রহ করা মধু স্বাদে, গন্ধে ও বর্ণে বিভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন পদ্মমধু, তেঁতুল ফুলের মধু, নিম ফুলের মধু ইত্যাদি।

প্রথম চিনিই হচ্ছে মধুচিনি। মধুচিনি প্রাচীন কালেরই আবিষ্কার। মৌচাক থেকে সংগ্রহ করা মধুকে একটি খোলা পাত্রে রেখে কয়েকদিন ধরে ফাঁকা জায়গায় বসিয়ে রাখা হতো। রোদ-হাওয়া লেগে মধু ঘনীভূত হতো। তারপর মধুর মিষ্টি অংশটা কেলাসিত হয়ে পাত্রের তলায় থিতিয়ে পড়তো এবং উপরে থাকতো জলীয় অংশটা। ছেঁকে নিলেই পাওয়া যতে কেলাসিত মধু তথা মধুচিনি। বর্তমানেও সেই একই প্রকারে মধুচিনি তৈরি করা হয় এবং বিরঞ্জকের সাহায্যে ওকে বিরঞ্জিত করা হয়। যদিও মধুচিনির ব্যবহার বর্তমানে সঙ্কুচিত। সেকালের মত বর্তমানে মধু সহজলভ্য নয়।

মধুচিনির ব্যবহার রোমানদের আমলে আরও বেড়েছিল। তারা মধুর সঙ্গে আফিম গাছের ফুলকে মিশিয়ে ভালভাবে উত্তপ্ত করতো। ভালভাবে পাক করার পর যে থকথকে জিনিসটি উৎপন্ন হতো তার উপরে ছড়িয়ে দিত মধুচিনি। এই মিষ্টি অভিজাতদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

সেকালে প্রাচ্যে অন্যান্য অনেক ধরনের মিষ্টি তৈরি হতো। তবে সব মিষ্টির

প্রধান উপাদান ছিল মধুচিনি বা শুধু মধু। বাদামের সঙ্গে, পাকা ডুমুর ফলের রসের সঙ্গে মধু বা মধুচিনি মিশিয়ে এবং পাক করে নানা ধরনের মিষ্টি তৈরি করতো। সম্ভবত গুড়ও তৈরি হয়েছিল সে-সময়। তিল ইত্যাদিকে গুড়ের সঙ্গে পাক করে তৈরি করতো নাড়ু।

ইওরোপে প্রথমে মিষ্টির পরিবর্তে মিষ্টি সিরাপ তৈরির প্রচলন হয়েছিল। প্রধান উপাদান ছিল মিষ্টিফলের রস। সেই সিরাপকে ওষুধেও ব্যবহার করা হতো। প্রকৃত মিষ্টি ইওরোপে কবে যে চালু হয়েছিল, সেকথা ঠিক করে বলার উপায় নেই। এই ব্যাপারে প্রাচ্যই অধিকতর অগ্রসর ছিল।

প্রকৃতপক্ষে চিনি বলতে আমরা যা বুঝি তার উৎপাদন সম্ভব হয়েছে সপ্তদশ শতাব্দীতে। তার পূর্বপর্যন্ত চলে আসছিল গুড়, মধু ও মধুচিনির যুগ। চিনি উৎপাদন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রমরম করে জমে উঠে মিষ্টির বাজার। সেসময় ইওরোপের বিভিন্ন দেশ নানা জায়গায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। উপনিবেশগুলোর যেসব জায়গায় আখ জন্মাতো সেইসব জায়গায় আখ থেকে চিনি উৎপাদন করতো এবং সমূহচিনি পাঠিয়ে দিতে স্বদেশে। সেই চিনি থেকে তৈরি হতো সিরাপ ও নানা ধরনের মিষ্টি। অবশ্য ছানার মিষ্টি তৈরি করতো না। সুমিষ্ট ফলের টুকরোকে চিনির সঙ্গে পাক করে তৈরি করতো মিষ্টি। এই জাতীয় মিষ্টি ফরাসিদের ছিল ভারি পছন্দ।

এবার চিনি তৈরির কথায় আসা যাক। চিনি তৈরি একেবারে হালফিল আমলের ব্যবস্থা। তবে আখও আখের গুড়ের সঙ্গে মানুষের পরিচয় হয়েছিল বহু আগে। ঐ আখ থেকে এখন পৃথিবীর বেশিরভাগ চিনি প্রতিবছর প্রস্তুত করা হয়। তাছাড়া আঙ্গুর, বিট প্রভৃতি থেকেও কিছু কিছু চিনি তৈরি হয়। বিট থেকে প্রস্তুত চিনিকে বলে বিটসুগার বা বিটচিনি এবং আঙ্গুর থেকে তৈরি চিনিকে বলে দ্রাক্ষা শর্করা।

আখ থেকে চিনি তৈরি করতে হলে প্রথমে আখকে কেটে টুকরো টুকরো করা হয়। তারপর পেষাই যন্ত্রে টুকরোগুলোকে পিষিয়ে রস বার করা হয়। ঐ রসে কিছু কিছু ময়লা থাকে। ময়লাকে পরিষ্কার করার জন্য প্রথম ছেঁকে নেওয়া হয় এবং পরে স্বল্প চুন প্রয়োগ করা হয়। ময়লাগুলো থিতিয়ে পড়লে ফিল্টার প্রেসে পাঠিয়ে ছেঁকে নেওয়া হয়। এবার রসটাকে বাষ্পীকরণ যন্ত্রে রেখে ঘন করা হয়। ঘন রস দেখতে অনেকটা বাদামী রঙের।

ঘন রসকে অতঃপর ভ্যাকুয়াম প্যানে রেখে উত্তপ্ত করলেই চিনির দানা উৎপন্ন হয়। তাকে আরও দানাদার করে তোলার জন্য ক্রিস্ট্যালাইজার যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। দানা গঠনের কাজ সম্পূর্ণ হলেই সেন্ট্রিফিউজ নামক এক ধরনের যন্ত্রের সাহায্যে পৃথক করে নেওয়া হয় চিনির দানাগুলোকে। এই চিনি ধবধবে শাদা হয় না। বিরঞ্জিত করলেই শাদা মোটাদানার চিনি পাওয়া যায়।

প্রথম প্রথম চিনি আজকের মত এত উন্নত মানের ছিল না। সেসময় ভালভাবে

বিরিঞ্জত করাও যেতো না। রসায়নবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে চিনির ঔৎকর্ষ যেমন বেড়েছে, তেমনই মিষ্টির নানা প্রকারভেদও এসেছে।

সাধারণ ঘণ্টা ও বৈদ্যুতিক ঘণ্টা

সাধারণ ঘণ্টা আঘাতের মাধ্যমে জোরালো শব্দ সৃষ্টির যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়। আদিতে ঘণ্টাধ্বনিকে সুরযুক্ত শব্দ বলে মনে করা হতো এবং বাদ্যবৃন্দের সঙ্গে ঘণ্টাকেও অন্তর্ভুক্ত করা হতো। কে বা কারা যে প্রথম শব্দসৃষ্টিকারী এই যন্ত্রটির উদ্ভাবন করেছিল তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে ঘণ্টা যে অতি প্রাচীনকালে তৈরি হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

অনেকের মতে ঘণ্টাও চীনদেশের আবিষ্কার। একটা প্রাচীন নমুনাও পাওয়া গেছে চীনে। নমুনাটি দেখে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন, খ্রীস্টজন্মের অন্ততঃ দু'হাজার বছর আগে চীনদেশের মানুষরা ঘণ্টা ব্যবহার করতেন। ধাতুনির্মিত ঘণ্টা নয়, কাঠের ঘণ্টা। একটা কাঠের পাটাতনের তলায় সূতো বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হতো ১৬ খানা পাথরের টুকরো। পাটাতনকে নাড়ালে পাথরের টুকরোগুলো হাতুড়ির মত বারে বারে পাটাতনে আঘাত করতো এবং এক অদ্ভুত ধরনের আওয়াজ উঠতো।

পরের দিকে ধাতুনির্মিত ঘণ্টার উদ্ভব হয়। ধাতুতে আঘাত করলে বেশ জোরালো আওয়াজ উঠে। তাই ধাতুর তৈরি বাটির মত জিনসের মাঝখান বরাবর একটা ভারি জিনিস ঝুলিয়ে জোরালো আওয়াজ সৃষ্টির মাধ্যম সৃষ্টি করেছিল। বাইবেলে উল্লেখ আছে, ঘোড়ার গলায় ঘণ্টাকে বাঁধা হতো। রাজা সোলেমান সেকালে একটা সোনার ঘণ্টা গড়িয়েছিলেন। একটি মন্দিরের গম্বুজের উপর স্থাপন করা হয়েছিল ঘণ্টাটিকে। বেশ বড় ধরনের ঘণ্টা। ঐ ঘণ্টার সাহায্যে পাখিদের তাড়ানো হতো। ঘণ্টা থেকে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল এবং নিচে দাঁড়িয়ে দড়িতে টান দিলেই ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজতো।

গ্রীক ও রোমান আমলে ছোট বড় নানা আকারের ঘণ্টা তৈরি হতো। এথেন্সের পুরোহিতেরা হাতে ঘণ্টা রাখতেন এবং নাড়তেন। আজকের দিনে আমাদের দেশের পুরুতমশাইরা যেভাবে পুজো করার সময় ঘণ্টা ধ্বনি করেন। সেকালে স্পার্টায় থাকতেন একদল ঘণ্টাবাদক। কোন রাজা মহারাজা মারা গেলে ঘণ্টাবাদকরা বেরিয়ে পড়তেন এবং পথে পথে ঘণ্টাধ্বনি করে ছুটতেন। অর্থাৎ ঘণ্টা ছিল সাধারণের কাছে সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যম। এমনও শোনা যায়, গ্রীসের মেয়েরা সেকালে ঘণ্টা বাজিয়ে বাজিয়ে পথ হাঁটতেন। সম্ভবত গ্রীক আমলে ঘণ্টা তৈরি হতো ব্রোঞ্জ নামক সঙ্কর ধাতুটির সাহায্যে। খননকার্যের ফলে লাভ করা গেছে সেকালের ব্রোঞ্জের তৈরি একাধিক ঘণ্টা। নিনেভ নগরীর ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের ঘণ্টা খ্রীস্টজন্মের ৬১৫ বছর আগে তৈরি হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়েছে। হাতুড়ি পিটিয়ে শব্দ উৎপন্ন করার ঘণ্টা আবিষ্কৃত হয়েছে আরও পরে। সম্ভবত খ্রীস্টজন্মের

প্রায় পাঁচশ বছর পরে।

প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে দু'ধরনের ঘণ্টার উদ্ভব হয়েছিল। প্রাচ্যের ঘণ্টার আকার ছিল অনেকটা বাটি কিংবা গামলার মত। ধাতুনির্মিত দণ্ডের দ্বারা আঘাত করে শব্দ উৎপন্ন করা হতো। পাশ্চাত্যের ঘণ্টার আকার বাটির মত হলেও বাটির মাঝখান থেকে একটা ভারি বস্তু দোলকের মত ঝুলে থাকতো। হাতল নাড়লেই শব্দ উঠতো। অবশ্য প্রাচ্যের তৈরি ঘণ্টারও হাতল থাকতো।

ঘণ্টার ব্যবহার এখনও সমানে চলছে। বরং ব্যবহার আরও বেড়েছে। ঘুঙুরও একজাতীয় ঘণ্টা। কাঁসর ঘণ্টার সঙ্গেও আমাদের পরিচয় যথেষ্ট। বাদ্যবৃন্দের সঙ্গে ঘুঙুর হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করার ঘণ্টা বা পেটা ঘড়ির ব্যবহার আজও অব্যাহত। আগে মন্দিরে, মসজিদে, গীর্জায় বড় বড় ঘণ্টা বেঁধে রাখা হতো এবং ঘণ্টাধ্বনি সময় ঘোষণা করতো। সেকালের সবচেয়ে বড় ঘণ্টা "মস্কোর ঘণ্টা" পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের অন্যতম এক আশ্চর্য ছিল।

ধনীদের প্রাসাদের বাহিরেও ঘণ্টা বেঁধে রাখা হতো। প্রাসাদের প্রধান দ্বারের সামনে। দ্বার সবসময় বন্ধ রাখা হতো। বাহিরের কোন আগন্তুক এলে তাঁকে ঘণ্টা নাড়তে হতো। তখন প্রহরী দ্বারা খুলে এগিয়ে আসতেন। এই ব্যবস্থা চলে এসেছিল বহুকাল। বর্তমানে তার স্থান অধিকার করেছে বৈদ্যুতিক ঘণ্টা।

বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বা কলিংবেলের আবিষ্কার ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। এর মূলে আছে একটি বিশেষ আবিষ্কার ইলেক্‌ট্রোম্যাগনেট বা তড়িৎ চুম্বক। তড়িৎ চুম্বক ইংরেজি "ইউ" (U) আকারের কাঁচা লোহার তৈরি দণ্ড। দণ্ডের দুই প্রান্ত একটি তার দিয়ে জড়ানো থাকে। তারের দুটি প্রান্তকে যুক্ত করা হয় একটি ব্যাটারির দুই তড়িৎদ্বারের সঙ্গে। যতক্ষণ তড়িৎপ্রবাহ চলে ততক্ষণ "U" আকারের দণ্ডটি সাময়িকভাবে চৌম্বকশক্তি লাভ করে। কিন্তু তড়িৎপ্রবাহ বন্ধ করলে চুম্বক আর থাকে না। পূর্বের সেই কাঁচা লোহায় ফিরে আসে।

বৈদ্যুতিক ঘণ্টার মূল উপাদান ঐ তড়িৎ চুম্বক। একটা কাঠের ফ্রেমের উপর তড়িৎ চুম্বককে শক্তভাবে আটকে দেওয়া হয়। চুম্বকের মেরুদ্বয়ের একটুখানি উপরে একটি লোহার পাতের একপ্রান্ত স্প্রিং-এর সাহায্যে আটকানো থাকে। অপরপ্রান্তে থাকে ছোট্ট হাতুড়ির মত একটা স্ক্রু। ব্যাটারি বা তড়িৎকোষের একটা প্রান্ত যুক্ত করা থাকে স্প্রিং-এর সঙ্গে এবং ব্যাটারির অপরপ্রান্ত যুক্ত করানো থাকে তড়িৎচুম্বক তথা তার জড়ানো 'U' আকারের কাঁচা লোহার দণ্ডের তারের প্রান্তের সঙ্গে। সুইচ টিপলে তড়িড়বর্তনী সম্পূর্ণ হয় এবং তৎক্ষণাৎ লৌহদণ্ডটি চুম্বকে পরিণত হয়। আর ঠিক তখনই চুম্বকের আকর্ষণে উপরের হাতুড়িযুক্ত লোহার পাত নেমে আসে এবং পাশে থাকা বাটির মত ঘণ্টার উপর আঘাত করে।

হাতুড়িটি নেমে এলেই তড়িৎবর্তনী ছিন্ন হয়ে যায় এবং তড়িৎ চুম্বকটাও তার চুম্বকত্ব হারায়। ফলে হাতুড়িটি পূর্বের অবস্থানে ফিরে যায়। আর ফিরে গেলেই

পুনরায় তড়িৎবর্তনী সম্পূর্ণ হয় এবং দণ্ডটি চুম্বকে পরিণত হয়। আগের মতই হাতুড়ি নেমে এসে ঘণ্টায় আঘাত করে। এইভাবে যতক্ষণ সুইচ টিপে রাখা হবে ততক্ষণ বারেবারে হাতুড়ি অতি দ্রুততার সঙ্গে উপরনিচ হতে থাকে এবং বারবার ঘণ্টাধ্বনি হয়।

বিদ্যুৎশক্তি

বিদ্যুৎশক্তির রহস্য উদ্‌ঘাটন সাম্প্রতিককালের ঘটনা বললে মনে হয় অত্যুক্তি হবে না। আমরা জানি, পদার্থের পরমাণুর নিউক্লিয়াসে ধনতড়িৎবিশিষ্ট এক বা একাধিক প্রোটন কণিকা যেমন থাকে তেমনই নিউক্লিয়াসের চারদিকে ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় থাকে সমসংখ্যক ঋণতড়িৎবিশিষ্ট ইলেকট্রন কণিকা। ইলেকট্রনরা বিভিন্ন কক্ষে বিভিন্ন সংখ্যায় দলবদ্ধভাবে ঘোরে। পদার্থের পরমাণুগুলোর ঐ ইলেকট্রনদের বিভিন্ন উপায়ে উত্তেজিত করালে যে ইলেকট্রনের স্রোত প্রবাহিত হয় তারই মাধ্যমে বিদ্যুৎশক্তির প্রকাশ ঘটে।

বিদ্যুতের ভয়ঙ্কর শক্তির পরিচয় আদিম মানবগোষ্ঠীও অনুমান করেছিল। কিন্তু কারণ জানতো না। দেখতো কড়কড় শব্দে বাজ পড়ে। হয়ত বাজপড়া গাছ থেকে প্রথম আগুনকে সংগ্রহ করেছিল।

এত বড় বড় যে গ্রীকপণ্ডিত তাঁরাও জানতেন না বিদ্যুতের প্রকৃত স্বরূপ। আকাশের বাজ সম্বন্ধে কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রদান করতে পারেননি। পারেননি তড়িৎপ্রবাহ সম্বন্ধে কোন মতবাদ রাখতে। তথাপি বিদ্যুৎ তথা ইলেকট্রিসিটি শব্দটি এসেছে গ্রীক ইলেকট্রন শব্দটি থেকে। গ্রীক ইলেকট্রন শব্দের অর্থ অ্যাম্বার। পাইন গাছের আঠাকেই বলা হয় অ্যাম্বার। খ্রীস্টজন্মের প্রায় ৬০০ বছর আগে প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক ও বিজ্ঞানী থ্যালেস অ্যাম্বারের এক বিশেষ শক্তির পরিচয় লাভ করেছিলেন। তাই এই নামকরণ। থ্যালেস লক্ষ্য করেছিলেন, অ্যাম্বারকে ঘর্ষণ করলে এক ধরনের শক্তির উদ্ভব হয়। সেই শক্তি ছোট ছোট কাগজের টুকরা বা হালকা কর্কের টুকরাকে আকর্ষণ করে।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। থ্যালেসের পরেও সম্ভবতঃ ঐ শক্তি সম্বন্ধে কোন গ্রীক পণ্ডিত গবেষণা করেননি। আবিষ্কারটি একরকম অবহেলিত অবস্থায়ই পড়েছিল। কেবল গ্রীকপণ্ডিতেরা নয়, ১৬৭২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন গবেষণা হয়নি। ঐ বছর অটো ভন গেরিক নামে জনৈক প্রযুক্তিবিদ গন্ধকের গোলাকে হাতে তালুতে ঘোরাতে গিয়ে এক ধরনের শক্তি অনুভব করেন। সেই থেকেই শুরু হয় স্থিরতড়িৎ সম্বন্ধে গবেষণা।

১৭২৯ খ্রীস্টাব্দে স্টিফেন গ্রে লক্ষ্য করেন, কিছু কিছু পদার্থ বিশেষ করে ধাতুরা বিদ্যুৎ পরিবহণে সক্ষম। অথচ কাচ, গন্ধক, মোম প্রভৃতি বিদ্যুৎ পরিবহণে অসমর্থ। সেই সময়ই পরিবহণে সক্ষম তথা পরিবাহীদের নামকরণ করা হয় কনডাকটার

এবং অপরিবাহীদের নাম রাখা হয় ইনসুলেটার। ১৭৩৩ খ্রীস্টাব্দে "ডুফে" নামে জনৈক ফরাসী বিজ্ঞানী "ধন" (পজিটিভ) এবং ঋণ (নেগেটিভ) তড়িৎপ্রবাহ আবিষ্কার করেন। তিনি মনে করেছিলেন, দুটি দু'ধরনের তড়িৎ।

অতঃপর প্রখ্যাত বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বিদ্যুৎ প্রবাহের কারণ নির্ণয়ে যত্নবান হন। দীর্ঘ গবেষণার পর তিনি সিদ্ধান্তে আসেন, প্রতিটি পদার্থের মধ্যে "ইলেকট্রিক ফ্লুইড" আছে। কোন কোন পদার্থকে ঘর্ষণ করলে ঐ ফ্লুইড নির্গত হয়। ফ্রাঙ্কলিন আবিষ্কৃত ফ্লুইড প্রকৃতপক্ষে ইলেকট্রন প্রবাহ। ফ্রাঙ্কলিনের পরে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে স্যার আলেকসান্দ্রো ভোল্টা তড়িৎকোষ আবিষ্কার করলে রহস্যের কিছুটা সমাধা হয়। কিন্তু ইলেকট্রন সম্বন্ধে ধারণা অনেক পরবর্তীকালের ঘটনা।

ভোল্টার পূর্ব-পর্যন্ত অর্থাৎ সেই থ্যালেসের আমল থেকে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের আমল পর্যন্ত স্থিরতড়িৎ তথা স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিল। স্থিরতড়িৎ বলতে তড়িৎশক্তিকে বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে কোন বস্তুর মধ্যে স্থিরভাবে আবদ্ধ রাখা। যখন বিদ্যুৎকে বিদ্যুৎ পরিবহণে সক্ষম এমন কোন ধাতুনির্মিত তারের মাধ্যমে প্রবাহিত করানো যায়, তথা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করা যায় এবং ঐ প্রবাহের মাধ্যমে আলো তাপ ইত্যাদি শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় তখন তাকে বলে চলবিদ্যুৎ বা কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যুৎ প্রবাহ বলতে পরিবাহী তারের মাধ্যমে ইলেকট্রন কণিকার ধারার আকারে গতিস্রোত। তড়িৎশক্তির উচ্চচাপের ফলে ঐ ইলেকট্রনরা ধনতড়িতের তথা প্রোটনের বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়। তড়িৎ প্রবাহের গতিপথকে তারের মাধ্যমে চক্রাকারে অবিচ্ছিন্ন রাখতে হয়। বিচ্ছিন্ন হলেই তড়িৎ প্রবাহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়।

রেডক্রস

অপরের উপর প্রভুত্ব স্থাপন মানুষের যেন জন্মগত একটা নেশা। যে যদি বলশালী হয় কিংবা বল সঞ্চয় করতে সক্ষম হয় তাহলে সে অপরের উপর আক্রমণ চালায়। আপন স্বার্থসিদ্ধির কারণে হত্যা, অত্যাচার, লুণ্ঠন প্রভৃতি নিষ্ঠুর আচরণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। তাই বারবার "কলঙ্কিত পৃথিবীর ইতিহাস"। মানবিক গুণাবলীকে বিসর্জন দিয়ে এই মানুষই কলঙ্কিত করেছে এবং এখনও করছে সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। কবির কথায় "কত যুদ্ধ কত ক্লেশ নাহি তার শেষ"। যুদ্ধোন্মাদদের নির্মম আচরণে বারেবারে রক্তস্নাত হয়েছে ধরণীর ধূলি। বলি হয়েছে কত কোটি কোটি মানুষ।

হাঁ, যুদ্ধ। সাধারণ মানুষ থেকে দরদী ও মরমীরা কোনকালেই যুদ্ধ চায়নি। আমরাও চাই না। চাই শান্তি—বিশ্ব শান্তি। চাই সারাপৃথিবীর মানুষ ভেদাভেদ এবং ক্ষমতালিপ্সা ভুলে একই পতাকার তলায় আশ্রয় গ্রহণ করুক। কিন্তু হয়নি, হয়ত

কোনদিন হবে না। হয়ত কোনদিনই পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে যাবে না দেশের গণ্ডীগুলো। তাই বিশ্বশান্তির পরিবেশ রচিত হলেও যুদ্ধ বন্ধ হয়নি। শান্তির বাতাবরণ ভেদ করেও আত্মপ্রকাশ করছে যুদ্ধ।

যুদ্ধের উন্মাদনা সেই আদিকাল থেকেই। নগর সভ্যতার পত্তনের পূর্বেও বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী যুদ্ধে লিপ্ত হতো। বিজয়ীরা বিজিতদের নির্মমভাবে হত্যা করতো। লুণ্ঠন করতো তাদের অস্ত্রশস্ত্র, নারী ও শিশু। নিজের দলকে শক্তিশালী করার জন্য। এমনও মনে করা হয়, আধুনিক ক্রোম্যাগনন মানুষ নিঃশেষ করে দিয়ে গেছে তাদের পূর্ববর্তী নিয়ানডার্থালদের।

যুদ্ধের উন্মাদনা আরও বৃদ্ধি পায় রাজপদ সৃষ্টি হওয়ার পরে। পৃথিবীর নানা জায়গায় এক একটা অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল এক একটি রাজ্য। প্রতি রাজ্যের পরিচালক হতেন এক একজন রাজা। বলদর্পীরাজারা অপরের রাজ্যকে গ্রাস করে নিজের রাজ্যসীমাকে বাড়াতেন। বিশাল অঞ্চলের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করা মনে হয় প্রতিটি রাজারই অভিপ্রায় ছিল। তাই অহরহ যুদ্ধ লেগে থাকতো পৃথিবীতে। এক রাজবংশ লুপ্ত হতো, প্রতিষ্ঠিত হতো অন্য রাজবংশের শাসন। সেই নগর সভ্যতার আমল থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত চলে এসেছিল যুদ্ধের প্রচণ্ড তাণ্ডব। তারপরেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত গড়ে উঠেছে।

যুদ্ধ এবং যুদ্ধক্ষেত্রের মত এমন মর্মান্তিক হৃদয়বিদারক দৃশ্য অপর কিছুই হতে পারে না। সেকালে ছিল আরও মর্মান্তিক এবং আরও ভয়াবহ। যতজন মৃত্যুবরণ করতো তার চেয়েও বেশি সংখ্যক গুরুতরভাবে আহত হয়ে যন্ত্রণার ছটফট করতো। একটুখানি জলের জন্য হাহাকার করতো আহতরা। কিন্তু কেউই সেই যন্ত্রণাকাতরদের সামনে হাজির হতো না। অন্নাভাবে, জলাভাবে এবং শুশ্রূষার অভাবে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতো। অজস্র শবদেহের মধ্যে পড়ে থাকতো এবং রাতে শেয়াল কুকুররা জ্যান্ত মানুষকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতো। আহতদের বুকফাটা হাহাকারে স্তব্ধ হয়ে উঠতো সেখানকার পরিবেশ। তবু কারও মনে মনে হয় করুণার উদ্রেক হতো না। মনে হয়, এই দৃশ্য সর্বপ্রথম পীড়া দিয়েছিল প্রাচীন ভারতে রাজর্ষি অশোককে। তাই তিনি কলিঙ্গ যুদ্ধের পর আর যুদ্ধ করেননি।

মনে হয় রাজর্ষি অশোকের পরে প্রায় দু'হাজার বছরেরও অধিক কালের মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রের নৃশংস ও পৈশাচিক দৃশ্য কোন রাজা মহারাজার মনকে নাড়া দেয়নি। সাধারণ মানুষকে হয়ত ভাবিয়ে তুলতো, কিন্তু ক্রূর সম্রাটদের বিরুদ্ধে কিছুই করার ছিল না। অবশেষে ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের কথা। জুন মাসের অতি তপ্ত এক মধ্যাহ্ন। একজন সুইস যুবক পরিত্যক্ত একটি যুদ্ধক্ষেত্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত মানুষের স্তূপের ভেতর থেকে উঠছে যন্ত্রণাকাতর আহত সৈনিকদের আর্ত চিৎকার। কী ভেবে তরুণটি যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে আরও এগিয়ে গেলেন। সেখানকার বীভৎস দৃশ্য দেখে কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়লেন। তারপর ছুটে

গেলেন পাশের এক গাঁয়ে। গ্রামবাসীদের কাছে আবেদন জানালেন, আহত ও হতভাগ্য সৈনিকদের জন্য একটুখানি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে। তিনি আরও বললেন, সামান্য একটু শুশ্রূষা করলে এবং ছিটেফোঁটা জল পেলে অনেকেই বেঁচে উঠতে পারবে।

তাঁর আবেদনে সাড়া দিলেন গাঁয়ের মানুষ। বিশেষ করে তরুণরা। তাঁরা দল বেঁধে কিছু খাদ্য, জল ও প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম নিয়ে ছুটে গেলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। তাঁদের আপ্রাণ চেষ্টায় আহত বহু সৈনিক প্রাণ ফিরে পেলেন।

সেই হৃদয়বান তরুণটির নাম হেনরি ডুন্যান্ট। যুদ্ধে আহত সৈনিকদের দুর্দশা তাঁকে এতই ভাবিয়ে তুলেছিল যে, মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই রচনা করে ফেললেন একটি পুস্তিকা। পুস্তিকাটি নিজব্যয়ে ছাপিয়ে বিলি করলেন দেশবিদেশের বহুজনের মধ্যে। তিনি পুস্তিকায় উল্লেখ করেছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের পরিত্যাগ না করে শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সবার জন্য সেবার হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। মুমূর্ষুদের বেলায় কোন ভেদাভেদ রাখা উচিত নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে যাঁরা আহত হবেন তাঁদের তৎক্ষণাৎ সরিয়ে এনে চিকিৎসা করাই হবে মনুষ্যোচিত ধর্ম।

হেনরি ডুন্যান্ট শুধু পুস্তিকা বিলি করে ক্ষান্ত হলেন না, এ-বিষয়ে জনমত গঠন করার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। কেবল নিজের দেশে নয়, পাশাপাশি দেশগুলোতে গমন করলেন এবং সর্বত্রই তুলে ধরলেন যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের দুরবস্থার কথা।

বহু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আহত সৈনিকদের দুর্দশার কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁরা হেনরির প্রস্তাবকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করলেন এবং তাঁরাও এগিয়ে এলেন এ-বিষয়ে বিশ্বজনমত গঠন করার জন্য। অতি অল্পকালের মধ্যে ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে এ-বিষয়ে আলোচনার জন্য জেনিভায় অনুষ্ঠিত হলো এক



মহাসম্মেলন। সেই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন পাশ্চাত্যের ১৪টি দেশ। সব দেশই সমর্থন করলো হেনরিকে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের সেবার জন্য কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হলো। প্রথম গঠিত হলো রেডক্রস সোসাইটি।

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে সেই জেনিভায় পুনরায় অনুষ্ঠিত হয় আর একটি সম্মেলন। ঐ সম্মেলনে আরও কয়েকটি শর্তকে যুক্ত করা হয়। স্থির হয়, প্রতিটি দেশকে অন্ততঃ একটি করে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। ঐ প্রতিষ্ঠান যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করবে এবং আহতদের সেবার ভার গ্রহণ করবে। প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের প্রতীকচিহ্ন হবে সুইস পতাকা। যাঁর গায়ে ঐ প্রতীকচিহ্ন আটকানো থাকবে তাঁকে কেউ আক্রমণ করতে পারবে না এবং যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে তাঁদের অবাধ যাতায়াতের জন্য পথ ছেড়ে দিতে হবে।

সেই থেকে বিভিন্ন দেশ গঠন করে রেডক্রস বাহিনী। বর্তমানে পৃথিবীর সবদেশই গঠন করেছে। শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, অন্যান্য জনসেবামূলক কর্মেও রেডক্রস আত্মনিয়োগ করেছে। এর মূল আদর্শ মানবিক মূল্যবোধ ও সেবাধর্ম। রেডক্রসের মাধ্যমে অমর হয়ে আছে হেনরি ডুন্যান্টের নাম।

তূলা, সূতাকাটা ও বস্ত্রবয়ন

মানুষ তুলার সন্ধান পেয়েছিল নব্যপ্রস্তর যুগে গুহা ছেড়ে বেরিয়ে আসার পরে। মানুষ সেসময় যাযাবরের জীবন যাপন করতো এবং পশুপালন করতো। পশুই ছিল সেসময় তাদের বড় সম্পদ। পশুর দুধ খেতো, মাংস খেতো এবং পশুর চামড়া থেকে পরিধেয় নির্মাণ করতো।

পশুপালন করতে হতো বলে যাযাবর হতে হয়েছিল তাদের। এক জায়গায় কিছুদিন অবস্থানের পর অরণ্যে এবং উপত্যকায় ঘাসপাতা শেষ হয়ে যেতো। তখন তাদের গমন করতে হতো স্থানান্তরে। সাধারণত কিশোররাই পশুর দলের সঙ্গে সঙ্গে থাকতো এবং নিজেদের পশুদের লক্ষ্য করতো।

বনের ভেতরে এবং তৃণভূমিতে স্থান থেকে স্থানান্তরে গমন করার সময় তারাই প্রথম তুলাগাছ লক্ষ্য করেছিল। ফসল ইত্যাদির মত তূলাও ছিল প্রকৃতির অবদান। তারা লক্ষ্য করতো, গুল্মজাতীয় এক ধরনের গাছ এক সময় ফুলে ফুলে ভরে যেতো। তারপর ঢুলি আসতো। সেই ঢুলি পেকে গেলে একেবারে দুধশাদা আঁশ ঢুলি বিদীর্ণ করে বেরিয়ে আসতো। গাছের চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়েও পড়তো। শাদা হয়ে উঠতো ঝোপের তলাটা।-গাছের মাথাটাও শাদা হয়ে থাকতো।

সম্ভবত ঐ কিশোররাই প্রথম পরখ করেছিল তূলাকে হাতে নিয়ে। পাক দিয়ে তারা সূতোও তৈরি করেছিল। না, যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীতই সূতা তৈরি করতো হাতে পাক দিয়ে। বেশ মোটা ধরনের সূতো। প্রথম প্রথম ঐ সূতো দিয়ে তারা মাছ ধরার জাল তৈরি করেছিল—যখন তারা নদীর উপর বসতি স্থাপন করেছিল। কাপড় তৈরির কথা তখনও ভাবেনি।

এদিকে দীর্ঘকাল পশুচর্ম পরিধানের পর এবং পরিবেশ কিছুটা উত্তপ্ত হয়ে পড়লে পশুচর্মের বিকল্প সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিল। মোলায়েম এবং আরামপ্রদ পরিধেয়। যার জন্য তারা প্রথমে পশুচর্মের বিকল্প হিসেবে গাছের বাকল পরতে শুরু করেছিল। অপরদিকে লম্বা লম্বা শুকনো তৃণকে কোমরের চারদিকে বেঁধে রাখতো পশুচর্মের বেল্ট দিয়ে। এই ব্যবস্থা চলে এসেছিল দীর্ঘকাল।

এরপরে তন্তুজাতীয় উদ্ভিদ ও সরু সরু শক্ত লতার সন্ধান পাওয়ার পর তারা চাটাই গোছের তৃণের কাপড় বানিয়েছিল। লম্বায় দু-হাত আড়াই হাত এবং চওড়ায় হাতখানেকের মত। কাঠের চৌকো ফ্রেম বেঁধে তাতে ঘন ঘন দড়ির টানা দিতো এবং সরু সরু তৃণকে দড়ির ভেতরে একটা ছেড়ে আর একটাকে ঢুকিয়ে বানাতো একজাতের পরিধেয়। পশুচর্ম ও গাছের বাকল অপেক্ষা এই চাটাইর মত একফালি কাপড় অনেকখানি আরামপ্রদ ছিল। আর ঠিক সেই সময় তাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল কার্পাস তুলার। সেই থেকে তুলোকে পাক দিয়ে সুতো তৈরির প্রচেষ্টা শুরু হয় এবং ঐ সুতো দিয়েই সেই চৌকো ফ্রেমে সুতোর কাপড় তৈরি করতে সক্ষম হয়। সুতো কাটার অতি পুরাতন যন্ত্র তকলি। কে বা কারা যে প্রথম পাথরের তকলি আবিষ্কার করেছিল তা জানা যায় না। তবু বলতে হবে এই আবিষ্কারটি মানব সভ্যতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে এটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

তকলির সাহায্যে সূতাকাটার পদ্ধতি চলে এসেছিল সুদীর্ঘকাল। সেকালে ঘরে ঘরে তূলার চাষ এবং তকলির সাহায্যে সূতা কাটা হতো। তূলোর চাষ প্রথম শুরু করেছিল মিশরীয়রা—সেই আদিকালে নগর সভ্যতার আমলে। এই উপায়ে প্রস্তুত কাপড় যথেষ্ট শ্রমসাধ্য ছিল। পরেব দিকে তাই উদ্ভব হয়েছিল দেশী তাঁতের। দেশী তাঁতের তৈরি কাপড়ই পৃথিবীর সমূদয় কাপড়ের চাহিদা মেটাতো। দুর্মূল্যও ছিল বলা যায়। ধনীরা এবং রাজরাজড়ারা ছাড়া সাধরণ মানুষ গামছার আকারের কাপড় কোমরে জড়াতো। মেয়েদের জন্য তৈরি হতো লম্বায় ও চওড়ায় কিছুটা বড় মাপের। গ্রামে গ্রামে তাঁতি ছিল এবং অনেকের ঘরেও তাঁত থাকতো।

তাঁত শিল্পের উন্নতি প্রথম শুরু হয়েছিল ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের দিনে। একটি যন্ত্র বহু মানুষের কাজ একাই সম্পন্ন করতে সক্ষম হওয়ায় ইংলণ্ডের কিছু মানুষ যন্ত্রের মাধ্যমে কাপড় বোনার চেষ্টা শুরু করেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন জন কে। দীর্ঘ পরিশ্রমের পর একদিন উদ্ভাবন করেন যন্ত্রচালিত এক ধরনের তাঁত। ঐ তাঁতের সাহায্যে আট দশজন তাঁতীর কাজ একাই সম্পন্ন করতে পারলেন।

জন কের ঐ তাঁত কিন্তু প্রথমে আদৌ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। তাঁতিরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। ভেবেছিল জন কে সবাইর ভাত মারবে। তাই একদিন সবাই মিলে জন কের তাঁতটাকে নষ্ট করে দিয়েছিল।

কে'র তাঁতের কথা কিন্তু ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। সুযোগসন্ধানীর সংখ্যাও পৃথিবীতে কোনসময়ে কম ছিল না। জন কে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারলেন

না। চারদিক থেকে অনেকেই এসে ধরে বসলো, তাদের একটি করে তাঁত বানিয়ে দিতে হবে। জন কেও পেয়ে গেলেন সুযোগ। তাঁতবোনা ছেড়ে শুরু করলেন তাঁত বানাতে। তৈরি হলো শত শত তাঁত। জমিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলেন জন কে।

কিন্তু যন্ত্রচালিত তাঁতের সংখ্যা বাড়লে কী হবে, সূতো তো চাই! এত সূতো আসবে কোথা থেকে? হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হলো যন্ত্রচালিত তাঁতের মালিকদের। তখনই যন্ত্রের সাহায্যে সূতাকাটার দিকে আগ্রহ প্রকাশ করেন কেউ কেউ। তূলা উৎপন্ন হয় পর্যাপ্ত। একটা মানুষ সারাদিনে আর কতটুকু সূতো কাটতে পারে?

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তকলির যুগ শেষ হয়। আবিষ্কৃত হয় সূতাকাটার কল। আবিষ্কারক রিচার্ড আর্করাইট। পেশায় তিনি ছিলেন একজন নাপিত। সূতার আকালের দিনে তাঁরই মাথায় মনে হয় প্রথম চেপেছিল সূতাকাটার যন্ত্র নির্মাণ। এর জন্য তাঁকে বহু কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। প্রথম নাপিতের কাজ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য সংসারে অভাব দেখা দিয়েছিল এবং সেই সময় ভদ্রলোকের স্ত্রী ভদ্রলোকের ঘাড় থেকে যন্ত্রভূতকে তাড়াতে তাঁর সমূহ যন্ত্রপাতিকে ভেঙে দিয়েছিলেন। ভদ্রলোক তাতেও হাল ছাড়েননি। ঘর থেকে পালিয়ে গিয়ে লোকালয় থেকে অল্পদূরে একটা ভাঙা স্কুলবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কাজ বেশ কিছুটা এগিয়েছিল। ভদ্রলোক রাতেই সাধারণতঃ কাজ করতেন। দিনের বেলায় চলতো নাপিতের কাজ।

বহুদিন পরিশ্রমের পর ভদ্রলোক সত্যসত্যই সফল হলেন। যন্ত্রের সাহায্যে পাক দিয়ে দিয়ে একগাছার বদলে দু-তিন গাছা সূতো বার করতে পারলেন। রাতে যখন ইঞ্জিন চালাতেন তখন বিশ্রী আওয়াজ উঠতো। সেই সময় ঘটে গেল আর একটা অঘটন। স্থানীয় মানুষদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতো বলে একদিন দিনের বেলায় আর্করাইটের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে যন্ত্রটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে গেল।

আর্করাইট ফিরে এসে কপালে করাঘাত করলেন। তবু ধৈর্য হারালেন না। কাউকে কিছু না জানিয়ে চলে গেলেন সুনির্জন এক জায়গায়। যেখানকার আশেপাশে আদৌ লোকালয় ছিল না। নাপিতের কাজও ছেড়ে দিলেন। পুনরায় মত্ত হয়ে উঠলেন যন্ত্র তৈরি করার জন্য। এবার তাঁকে আর বেশি বেগ পেতে হয়নি। অল্পদিনের ভেতরেই উদ্ভাবন করেছিলেন সূতা কাটার যন্ত্র। একই সঙ্গে সাতগাছি সূতো বার হলো যন্ত্র থেকে। যন্ত্রকে হাত দিয়েও ঘোরাতে হলো না। জলস্রোতকে কাজে লাগিয়ে যন্ত্রকে ঘোরানো গেল। নাম ওয়াটার ফ্রেম।

সেই থেকেই সূতীবস্ত্র সুলভ হয়েছে এবং তৈরি করাও সহজ হয়েছে। বস্ত্রশিল্পে ইংলণ্ডে সেসময় বিপ্লব ঘটেছিল এবং ইংলণ্ড বেশ অর্থ উপার্জনও করেছিল। পরের দিকে পদ্ধতিগুলির আরও উন্নতি হয়েছে এবং দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আধুনিক কালে সূতার বদলে তৈরি হচ্ছে কৃত্রিম তন্তু।

আদিম ছাপাখানা

আধুনিক ছাপাখানা গুটেনবার্গের হাতেই শুরু সে কাহিনী অন্যখণ্ডে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু গুটেনবার্গের বহু আগে চীনদেশে ছাপাখানা তৈরি হয়েছিল। যদিও পদ্ধতিটি আদৌ জনপ্রিয় হয়নি।

মানুষ মনের ভাবকে ধরে রাখার জন্য প্রথম থেকে বহু প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। প্রথম প্রথম লেখার পদ্ধতি প্রচলিত হলে লেখকের লেখাকে চিরস্থায়ী করতে নানা পন্থা অবলম্বন করেছিল। লিখতো কচ্ছপের খোলে, মাটির ফলকে ইত্যাদিতে। মাটির ফলককে অবশ্য পুড়িয়ে ফেলা হতো। সম্রাট হামুরাবি সংগ্রহ করেছিলেন মাটির ফলকে লেখা সহস্র সহস্র পুস্তক। ধ্বংসাবশেষ থেকে যেগুলোর অধিকাংশ উদ্ধার করা হয়েছে।

লেখাকে স্থায়ী করা এবং লেখা ছাপানো এককথা নয়। লেখাকে ছাপানোর প্রথম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল চীনদেশ। খামখেয়ালি এক রাজার খেয়ালকে চরিতার্থ করতে গিয়ে রাজ্যের প্রধান আমাত্য ব্যবস্থাটা গ্রহণ করেছিলেন। নাম তাঁর ফুংতে।

ঘটনাটি ঘটেছিল খ্রীস্টীয় নবম শতাব্দীতে। সেকালে চীনদেশে রাজার নির্দেশ প্রজাসাধারণকে জানানোর জন্য একদল লিখিয়েছিল। রাজার নির্দেশকে লিপিবদ্ধ করার পর লিখিয়েরা গণ্ডা গণ্ডা কাগজে একই নির্দেশ লিখতে বসে যেতেন। তারপর যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিলিপি তৈরি হলে এক একটাকে পথের মোড়ে, বাজারে, মন্দিরের গাত্রে আজকের বিজ্ঞাপনের মত সেঁটে দেওয়া হতো। প্রজারা পাঠ করতেন।

রাজা খেয়ালি হওয়ার জন্যই ঘন ঘন নির্দেশ বিলি করতে হতো। অপরদিকে সব লিখিয়ের লেখাও তাঁর পছন্দ হতো না। ভাল হাতের লেখা দু-একজনের ছিল বলেই তাঁদের বেশি করে কাজ করতে হতো। কিন্তু সামান্য দু-চারজনের পক্ষে অল্পসময়ের মধ্যে শত শত প্রতিলিপি তৈরি করা সম্ভব ছিল না। প্রধান আমাত্যকে অত্যন্ত বিব্রত হতে হলো।

রাজার আদেশ প্রতিপালনের জন্য তিনি নানা উপায়ের কথা চিন্তা করলেন। একসময় মনে হলো, যদি কাঠের উপর লেখাটাকে খোদাই করে নেওয়া যায় তাহলে সেইটার গায়ে কালি মাখিয়ে ছাপ দিলে অতি অল্পসময়ে বহু প্রতিলিপি তৈরি হয়ে যাবে।

অনেক চিন্তা-ভাবনা করে তিনি এক বৃদ্ধ ছুতার মিস্ত্রীর শরণাপন্ন হলেন। মিস্ত্রীকে বললেন সব কথা। মিস্ত্রীটিও উৎসাহিত হলেন এবং দলবল নিয়ে বসে গেলেন লেখাটাকে নরম কাঠের উপর খোদাই করতে। কয়েকঘণ্টার মধ্যেই খোদাইর কাজ সম্পন্ন হলো। মন্ত্রীমশাই নিজেই তার উপর কালি ঘষে ছাপ দিলেন কাগজে।

কিন্তু এ কী? লেখাগুলো যে সব উল্টো হয়ে গেছে। তখনই তাঁর মাথায় আসে, লেখার উল্টো হরফ যদি কাঠের ব্লকে খোদাই করা যায় তাহলে অবশ্যই সুফল

পাওয়া যাবে। তৎক্ষণাৎ মন্ত্রী মিস্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন অপর কাঠের ফলকে ছাপ দেওয়া কাগজের লেখার মতই উল্টো হরফ তৈরি করতে।

মিস্ত্রীও লেগে গেলেন কাজে। এবার মন্ত্রীমশাইর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো। ছুতার মিস্ত্রীটির নাম ছিল পীচিং।

মন্ত্রীমশাই এ-বিষয়ে আরও চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন। তিনি ছাপার জন্য মাটির অক্ষর তৈরি করে পুড়িয়েছিলেন। এগুলো ভঙ্গুর বলে বর্ণমালার প্রক্যেকটির জন্য অন্ততঃ দশটা করে তৈরি করেছিলেন। রাজার নির্দেশ ছাপতে হলে কাঠের ব্লকে শুধু অক্ষরগুলোকে সাজিয়ে দিতে হতো। তারপর কাগজে ছাপ দিয়ে যত খুশি প্রতিলিপি তৈরি করা যেতো। ঐ পদ্ধতিতে সেকালে চীনে কিছু কিছু বৌদ্ধ পুঁথিকেও ছাপানো হয়েছিল।

পরবর্তীকালে চীনে এই পদ্ধতি একরকম পরিত্যক্ত হয়েছিল।

হাতে টানা রিকশা

"শা" জাপানি শব্দ। অর্থ গাড়ি। তাই রিকশা যে প্রথম জাপানে তৈরি হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অথচ এখন জাপানে রিকশার একরকম চিহ্নমাত্র নেই। আমাদের দেশে কিন্তু রিকশার প্রচলন এখনও আছে। হাতেটানা রিকশা থেকে সাইকেল রিকশা, ভ্যানরিকশা সবই যত্রতত্র দেখা যায়। তবে হাতেটানা রিকশার প্রচলন কমেছে। কলিকাতা শহরেই চোখে পড়ে।

রিকশার প্রতি বর্তমানে অনেকের নজর পড়েছে। বিভিন্ন দেশ রিকশা ব্যবহারে উদ্যোগী হয়েছে। কারণ, রিকশার মাধ্যমে পরিবেশের দূষণ ঘটেনা। অল্প পথ অতিক্রম করতে রিকশা বেশ ভালই। তবে অতি মন্থর যান। ঐ কারণে রিকশার প্রতি মানুষের আগ্রহ কম। তাসত্ত্বেও বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের গ্রামেগঞ্জে রিকশার যথেষ্ট প্রচলন। গরুর গাড়ির পরিবর্তে বর্তমানে যাত্রী ও মাল পরিবহনে রিকশার জুড়ি নেই।

আগেই বলা হয়েছে রিকশার আবিষ্কর্তা জাপান। বেশ প্রাচীনকালে খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকে দেশের ধনীমানুষদের বহন করার যান পালকির কিছুটা পরিবর্তন এসেছিল। পালকি অবশ্য সব দেশেই ছিল। ভারতেও এর উদ্ভব হয়েছিল খ্রীস্টজন্মেরও আগে। পালকিকে বহন করতো চারজন বেয়ারা।

অষ্টম কিংবা নবম শতাব্দীতে জাপানিরা ঐ পালকির দুদিকে দুটি কাঠের চাকা যুক্ত করেছিল। চাকার দুদিকে কাঠের পাটাতনের ছাদ এবং ছাদের উপর পালকি। ঠ্যালা গাড়ির মত ঐ পালকিকে মাত্র একজন কিংবা দুজন মানুষ ঠেলে নিয়ে যেতে পারতো। বেশি লোকের দরকার হতো না। ঐ পালকির নাম ছিল রেনশা।

সেই থেকে চলে আসছিল রেনশার কাল। তারপর শুরু হয় ঘোড়ার গাড়ির

যুগ। ঐ ঘোড়ার গাড়ি দেখে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের দিকে কয়েকজন জাপানি প্রযুক্তিবিদ হাতেটানা দু'চাকার গাড়ির প্রবর্তন করেন। নাম দেওয়া হয় **জিনরিকিশা**। শা অর্থে গাড়ি এবং জিনরিকি অর্থে মানবশক্তি। মানুষ আপন শক্তি প্রয়োগ করে ঐ গাড়িতে টেনে নিয়ে যেতো বলে অনুরূপ নামকরণ হয়েছিল।

জিনরিকিশা হাতেটানা রিকশার আদিরূপ। কাঠের পাটাতনের উপর বসার আসন এবং সামনে হাতল। পাটাতনের চারকোণে চারখানা খুঁটি খাড়া করে উপরে কাপড়ের চাঁদোয়ার মত করা থাকতো। পরের দিকে বাঁশের তৈরি একটা ফ্রেমে কাপড় জড়ানো হয়েছিল। ফ্রেমটাকে ইচ্ছানুযায়ী গুটানো যেতো কিংবা খাড়া করা যেতো।

১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের দিকে ঐ জিনরিকিশার আরও উন্নতি করেন আকিবা নামে এক ভদ্রলোক। তিনি জিনরিকিশা তৈরি করে ব্যবসা করতে চেয়েছিলেন। লাভও করেছিলেন এবং শীঘ্রই লাভ করেছিলেন সরকারি অনুমোদন। প্রচুর জিনরিকিশা তৈরি করেন ভদ্রলোক এবং বিদেশে রপ্তানিও শুরু করেন। অনেক দেশ সেদিন জিনরিকিশা ক্রয় করেছিল। তাদের মধ্যে ভারত অন্যতম। ঐ জিনরিকিশাই আমাদের কাছে রিকশা নামে পরিচিত।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত সারাজাপানে প্রচলিত ছিল জিনরিকিশা তথা হাতেটানা রিকশা। তারপর মোটর গাড়ির যুগ শুরু হলে ওর দিনও ফুরিয়ে যায়। ভারত প্রভৃতি দেশে তাদের পরিকল্পিত রিকিশার উন্নতরূপ দিয়েছে সাইকেল রিকশা তৈরি করে। মনে হয় আমাদের দেশে আরও বহুকাল এর কদর থাকবে।

আদিকালের সপ্ত আশ্চর্য

পুরাকাল থেকেই পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের কথা উল্লেখ হয়ে আসছে। সবগুলিই পুরাকীর্তি। যদিও কালে কালে পৃথিবীর আশ্চর্যজনক তথা দর্শনীয় বস্তুগুলির সংখ্যা বেড়েছে, তবু প্রাচীনকালে কল্পিত সপ্তাশ্চর্যগুলো এখনও মানুষ স্মরণ করে। সেই হিসেবে আজকের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের যুগে আমরা অনেক কিছুকেই আশ্চর্য বস্তুগুলোর অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। উড়োজাহাজ থেকে মহাকাশযান, সমুদ্রবক্ষে জাহাজ নির্মিত কৃত্রিম শহর, মহাকাশে ঘাঁটি স্থাপন, ক্লোনিং ব্যবস্থা প্রভৃতি সবই আশ্চর্যজনক। তবু পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের কথায় প্রাচীন পুরাকীর্তিগুলোর নামই প্রচলিত আছে এবং সেগুলো বর্তমানে কিংবদন্তীতে রূপান্তরিত। সেগুলোর সবই প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। কালের ভ্রূকুটিকে তুচ্ছ করে দাঁড়িয়ে আছে মাত্র একটি— মিশরের পিরামিড।

প্রথম আশ্চর্যই হচ্ছে মিশরের পিরামিড। বহু পিরামিড নির্মিত হয়েছিল। অনেকগুলিই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, অক্ষত আছে অল্প কয়েকটি। মিশরীয়

নগর সভ্যতার যুগে এগুলো নির্মিত হয়েছিল।

পিরামিড মিশরীয় রাজাদের কবরখানা। মিশরের রাজারা সেকালে এক একজন সারা জীবন ধরে পিরামিড রচনার কাজে ব্যস্ত থাকতেন। মৃত্যুর পর তাঁর দেহকে মামীতে পরিণত করার পর সমাহিত করা হতো পিরামিডের তলায়। বিশাল উচ্চতাবিশিষ্ট ঐ পিরামিড তৈরি হতো চৌকো চৌকো পাথর দিয়ে। সাধারণতঃ ক্রীতদাসেরাই ঐ কাজে অংশগ্রহণ করতো। এখনও পিরামিড দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।



দ্বিতীয় আশ্চর্য ছিল ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান। খ্রীস্টপূর্ব ৬০০ অব্দের দিকে তৈরি হয়েছিল। তৈরি করেছিলেন আসিরীয় সম্রাট নেবুকাডনেজার। মহারানীকে খুশি করার জন্য একটি প্রাসাদের ধাপে ধাপে প্রায় ১০০ মিটার উঁচুতে উদ্যান তৈরি করেছিলেন। বর্তমানে সেটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

তৃতীয় আশ্চর্য গ্রীসের অলিম্পিয়ায় দেবরাজ জিউসের মূর্তি। গ্রীক পুরাকীর্তির একটি বিশেষ নমুনা। মূর্তিটি ছিল ১২ মিটার উচ্চ। সোনা এবং হস্তিদন্ত দিয়ে তৈরি হয়েছিল। মূর্তিটির দুটি চোখে ছিল দুটি বহুমূল্য রত্ন পাথর। ভূমিকম্পের ফলে মন্দির সহ মূর্তিটি তলিয়ে গেছে মাটির মধ্যে। বর্তমানে তার চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট নেই।

চতুর্থ আশ্চর্য ছিল এফিসাসে নির্মিত দেবী ডায়নার মন্দির। সেকালে তুর্কীরা তৈরি করেছিলেন। পাথরের তৈরি মন্দির। ছাদ পর্যন্ত উচ্চতা ছিল ১৮ মিটার। গ্রীক ভাস্কর্যের অনুকরণে তৈরি হয়েছিল মন্দিরটি। ২৬২ খ্রীস্টাব্দে গথরা মন্দিরটিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এরও কোন চিহ্ন নেই এখন।

পঞ্চম আশ্চর্য হেলিকার্ণাসাস শহরের একটি সুদৃশ্য ও অতি বিস্ময়কর গম্বুজ। এটিও তুর্কীদের কীর্তি। রাজা মৌসোলাস এটিকে নির্মাণ করেছিলেন। নির্মাণকার্য শেষ হয়েছিল ৩৫৩ খ্রীস্টপূর্বাব্দে। গম্বুজটির সাজসজ্জা এত অপরূপ ছিল যে এবং

এত প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছিল যে রাজা মৌসোলাসের নাম পরের দিকে প্রবচনে পরিণত হয়েছে। আশ্চর্য ও সুন্দর ধরনের প্যাণ্ডেল সজ্জাকে আজও মৌসোলিয়াম বলা হয়। ঐ গম্বুজও বর্তমানে নেই।

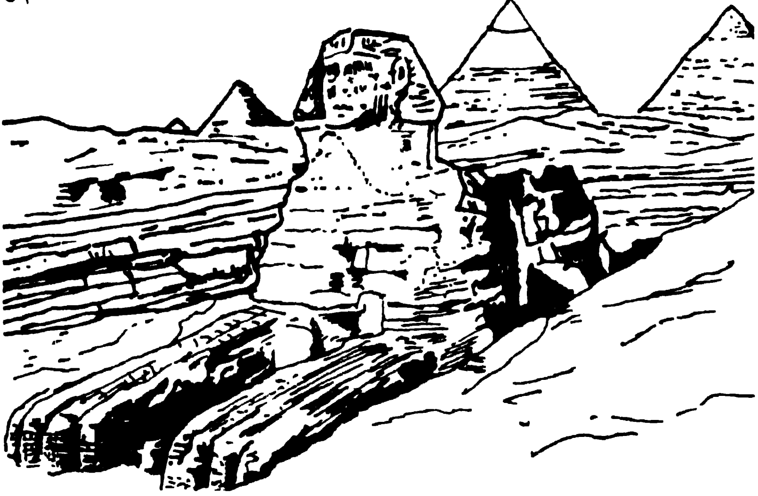
ষষ্ঠ আশ্চর্য কলোসাস রোডসের হেলিওসের আশ্চর্যজনক মূর্তি। হেলিওস সূর্য দেবতা। রোডদ্বীপে অবস্থিত ছিল। মূর্তিটির উচ্চতা ছিল ৩২ মিটার। খ্রীস্টপূর্ব ২২৪ অব্দে বিধ্বংসী এক ভূমিকম্পে নষ্ট হয়ে গেছে। এরও কোন চিহ্ন নেই বর্তমানে।

সপ্তম আশ্চর্য হিসেবে ধরা হয়েছিল ফ্যারোসের লাইট হাউস। নির্মাণকর্ম সম্পন্ন হয়েছিল ২৮৩ খ্রীস্টপূর্বাব্দে। মিশরের তীরভূমিতে ফ্যারোস দ্বীপে সমুদ্রের জাহাজগুলোকে রাতে পথ নির্দেশের জন্য তৈরি হয়েছিল এই লাইট হাউস বা আলোক স্তম্ভ। সম্ভবত আলোক স্তম্ভের উচ্চতা ছিল ১৮০ মিটার। মাথার উপরে রাতে অতি উজ্জ্বল আলোকশিখা বসানো থাকতো। সে আলোক বহু দূরবর্তী জাহাজের নাবিকরাও দেখতে পেতেন। প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে জাহাজের পথ নির্দেশকের কাজ করে গেছে এই আলোক স্তম্ভটি। বিদ্যুৎকে কাজে লাগানোর আগে পর্যন্ত এমন সরঞ্জামের ব্যবস্থা দ্বিতীয় হয়নি। এটিও ভূমিকম্পের ফলে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে।

মিশরের স্ফিংস মূর্তি

স্ফিংস মূর্তি চিরকালের একটি বিস্ময় হয়ে আছে। পাথর কেটে তৈরি করা অনেকগুলি মূর্তি এখনও আছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মূর্তিটি মিশরের মরুভূমিতে রাজধানী কাইরো থেকে ৮ মাইল দূরে গিজার তিনটি বৃহৎ পিরামিডের রক্ষক। দৈত্যাকৃতি এই মূর্তি। মাথাটা মানুষের মত এবং দেহটা দুটো পা সামনে পেতে চুপচাপ বসে থাকা একটি সিংহের মত। উচ্চতায় ১৮ মিটার এবং দৈর্ঘ্যে ৫৭ মিটার। খ্রীস্টজন্মের প্রায় তিন হাজার বছর আগে এটিকে নির্মাণ করা হয়েছিল বলে পণ্ডিতেরা মনে করে। দৈত্যাকৃতি স্ফিংস মূর্তির বিশেষ বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করা যায়। মাথাটা ঈষৎ হেলানো এবং উদ্বেগপূর্ণ রহস্যজনক চোখের দৃষ্টি। ঐ দৃষ্টির তাৎপর্য আজও কেউ ব্যাখ্যা করতে পারেননি। দৃষ্টি যেন সারা মরুভূমিতে আবদ্ধ। এই মূর্তি কেন যে নির্মাণ করা হয়েছিল সে বিষয়ে বিশেষ কোন তথ্য লাভ করা যায় না। একটিমাত্র প্রমাণ পাওয়া গেছে, ঐ মূর্তির থাবাদুটোর মাঝখানের একটি নমুনা থেকে। নমুনাটিতে খোদাই করা আছে দুজন প্রাচীন মিশরীয় রাজার নাম। নমুনাটি থেকে আন্দাজ করা হয়েছে, স্ফিংস সূর্যদেবতা হারমাসিসের প্রতীক। পিরামিডগুলোকে ঘিরে যে কবরখানা—সেই কবরখানার উপর যাতে কোন অশুভ দৃষ্টি না পড়ে তার জন্যই নির্মাণ করা হয়েছিল। এককথায় অশুভ শক্তি বিনাশের জন্য স্ফিংস মূর্তি বসানো হয়েছিল।

বৃহত্তম স্ফিংস মূর্তির পাশে আরও অনেকগুলি স্ফিংস মূর্তি আছে। তাদের মাথা যেকালের এক একজন মিশরীয় রাজার নির্দেশক। স্ফিংস শব্দের অর্থ একচ্ছত্রাধিপতি। প্রাচীন মিশরীয়রা মনে করতেন রাজারা শক্তি এবং চতুরতা পশুদের কাছ থেকে লাভ করে থাকেন। পশুর চামড়ার উপর নিজের মাথাকে খোদাই করলেই লাভ করা যায় সেই শক্তি। ঐ কারণে মিশরীয় দেবতা এবং রাজাদের মূর্তির আকার অর্ধমানব ও অর্ধপশু। দেবতাদের মাথা কোননা কোন পশুর মত এবং দেহটা মানুষের মত।



স্ফিংস তৈরি মিশর থেকে অন্যান্য দেশেও সে সময়ে বিস্তারলাভ করেছিল। আসিরীয় এবং গ্রীকরাও তৈরি করেছিলেন। আসিরীয়দের গড়া মূর্তির মাথা ছিল পুরুষদের মত কিন্তু গ্রীকদের মূর্তির মাথা নারীর মাথা অনুযায়ী। স্ফিংস শব্দটি আসলে গ্রীক শব্দ।

গ্রীকরা স্ফিংসকে একটি ড্রাগনরূপেই গণ্য করেছিলেন। সেকালে ড্রাগনকে বিশ্বাস করতেন অনেকেই। ভয়ঙ্কর শক্তিশালী এবং শুভ সবকিছুকে ধ্বংস করার মানসিকতা তার প্রচণ্ড। আমাদের দেশের কল্পিত দৈত্যদের মত। কিন্তু চেহারায় দৈত্যের সঙ্গে মিল নেই। বিশালকায় সাপের মত। যেমন মোটা তেমনই লম্বা। চোখ দিয়ে সবসময় আগুন ছিটকে আসে। বিরাট হাঁ এবং বিরাট লকলকে জিভ। ভারতীয় পুরাণে বর্ণিত দৈত্যরা অনেকটা মানুষের মত।

স্ফিংস সম্বন্ধে গ্রীসে একটি পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত হয়েছিল। বেশ মজার সে কাহিনী। শিক্ষনীয়ও বলা যায়। যদিও হেঁয়ালি আছে।

একবার এক ভয়ঙ্কর ড্রাগনের আবির্ভাব হয়েছিল। সে মানুষদের ধরে ধরে খেতো। দেশের রাজা তাকে কিছুতেই বশে আনতে পারলেন না। শেষে অনেক

অনুনয়ের পর ড্রাগনটা বলেছিল, যদি কেউ তার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে তাহলে সে সঙ্গে সঙ্গে পাথরে পরিণত হয়ে যাবে। আর যতদিন না কেউ তার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে ততদিন সংহার কাজ চালিয়ে যাবে। রাজার অনেক সাধাসাধিতে ড্রাগনটি আরও সম্মত হয়, প্রতিদিন রাজা তাকে যে মানুষটিকে প্রেরণ করবে সেই মানুষটিকেই ভক্ষণ করবে। সে নিজে আর হত্যা করবে না।

প্রশ্নটি কী ছিল?

"কোন প্রাণী সকালবেলায় চারপায়ে হাঁটে, দুপুরবেলায় হাঁটে দু'পায়ে এবং সন্ধ্যায় হাঁটে তিন পায়ে ভর করে?"

প্রশ্নের উত্তর সহসা কেউ দিতে পারেনি। শেষপর্যন্ত অডিপাউস নামে এক তরুণ এর উত্তর প্রদান করেছিলেন। বলেছিলেন মানুষই সেই প্রাণী যে সকালবেলায় অর্থাৎ শৈশবে হামাগুড়ি দেয়, বয়সকালে হাঁটে দু'পায়ে এবং সন্ধ্যায় তথা বৃদ্ধবয়সে লাঠি ভর করে তিন পায়ে হাঁটে। সেই থেকে ড্রাগন প্রস্তরমূর্তিতে পরিণত হয়েছে।

পিসার হেলানো টাওয়ার

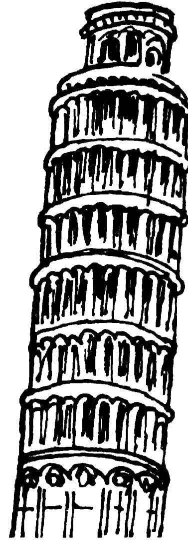
ইতালির একটি শহরের নাম পিসা। এখানে একটি টাওয়ার আছে অনেকটা কলিকাতার মনুমেন্টের মত। কিন্তু এটি খাড়াভাবে নেই। ঈষৎ হেলানো অবস্থায় রয়েছে। টাওয়ারটির সঙ্গে মহামতি গ্যালিলিওর নাম যুক্ত। পিসার ঐ টাওয়ারের শীর্ষদেশে থেকে তিনি অনেক পরীক্ষা চালিয়েছিলেন এবং বহু বৈজ্ঞানিক সত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাই বিজ্ঞানের ইতিহাসে পিসার টাওয়ারের গুরুত্ব অনেকখানি। গ্যালিলিওও জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঐ পিসা শহরে। এদিক থেকে তো বটেই, পিসা শহরের ঐতিহাসিক গুরুত্বও আছে।

পিসার টাওয়ার সত্যিই এক আশ্চর্যজনক বস্তু। দর্শনীয় বস্তু হিসেবেও ওর সুনাম জগৎজোড়া। আগাগোড়া মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরি। টাওয়ারের দেওয়াল চার মিটারের মত পুরু। আটতলা। উচ্চতায় ৫৪.৫ মিটার আজকের দিনে পনের-ষোল তলা উঁচু অট্টালিকার সমান।

উপরে ওঠার জন্য সিঁড়ি আছে। সিঁড়ির ধাপসংখ্যা ৩০০। যে কেউ সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠলে সারা শহরটাকে দেখতে পায়। দেখতে পায় সমুদ্রকেও। সমুদ্রের দূরত্ব প্রায় ছয় মাইল।

পিসার টাওয়ারের বৈশিষ্ট্য, এটি হেলানো অবস্থায় আছে। এমনটি পৃথিবীর অপর কোথাও দেখা যায় না। অথচ হেলান দেওয়া অবস্থায় দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে শতাব্দীর পর শতাব্দী। ঝড়. ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগেও পড়ে যাচ্ছে না। এটিকে কেন যে হেলান দেওয়া অবস্থায় তৈরি করা হয়েছিল তা কেউ বলতে পারেন না। শুধু একটি কারণ অনুমান করা হয়েছে।

টাওয়ারের শীর্ষদেশটা লম্বভাবে আছে পাঁচ মিটার অবধি। ভূমি থেকে শীর্ষ পাঁচ মিটার হেলান দেওয়া অবস্থায় আছে। শীর্ষ থেকে কোন ভারি জিনিসকে ছেড়ে দিলে টাওয়ারের ভূমির দেওয়াল থেকে ৫ মিটার দূরে পতিত হয়। টাওয়ারটি বেঁকে থাকার কারণ অজ্ঞাত হলেও বর্তমানে অনুমান করা হয়, যখন তৈরি করা হয়েছিল তখন বাঁকানো ছিল না। সোজা উপরের দিকে উঠেছিল। তৈরি শুরু হয়েছিল ১১৭৪



খ্রীস্টাব্দে এবং নির্মাণকার্য শেষ হয়েছিল ১৩৫০ খ্রীস্টাব্দে। কেউ কেউ মনে করেন, তিনতলা অবধি গাঁথা হলে যাঁরা নির্মাণকার্য চালাচ্ছিলেন তাঁদের মনে হয় টাওয়ারটি সোজা না উঠে একটু হেলান দেওয়া অবস্থায় এসে গেছে। তখনই নির্মাণকার্যের পরিকল্পনা স্বল্প পরিবর্তন করা হয়েছিল। টাওয়ারটি কিন্তু ধীরে ধীরে আরও হেলিয়ে পড়ছে। বিগত একশ বছরে ৩০ সেন্টিমিটারের মত বেঁকেছে। কিছুকিছু প্রযুক্তিবিদের মতে এটি একদিন ভারসাম্য রক্ষা করতে পারবে না এবং ভূপতিত হবেই।

চীনের প্রাচীর

গৃহের সুরক্ষার জন্য কিংবা দস্যু তস্করদের হাত থেকে রক্ষার জন্য যেমন প্রাচীর, দুর্গকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য যেমন প্রাকার ও প্রাচীর তেমনই দেশকে বৈদেশিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য অতি প্রাচীনকালে চীন দেশ একটি প্রাচীর নির্মাণ করেছিল। সে প্রাচীর এককালে পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের অন্যতম আশ্চর্য হিসেবে চিহ্নিতও হয়েছিল। আজ তার ধ্বংসাবশেষটুকুই রয়েছে।

খ্রীস্টজন্মের ২২১ বছর আগে সম্রাট সি হুয়াংতি নামে এক পরাক্রান্ত সম্রাটের আমলে প্রাচীর শুরু হয়েছিল। তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন এবং পাশাপাশি অনেকগুলো দেশ জয় করে রাজ্যসীমা বাড়িয়েছিলেন। কিন্তু রাজ্যের উত্তরে মরু এলাকার দুঃসাহসিক বর্বরজাতির অতর্কিত আক্রমণকে পরিপূর্ণভাবে ঠেকাতে পারেননি। ওরা যখন তখন হানা দিতো এবং লুণ্ঠন চালাতো। কিন্তু সম্রাটের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হতো না।

সম্রাট অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন এবং আদেশ দেন চীনের উত্তরাংশ জুড়ে একটি প্রাচীর তৈরির জন্য। তিনি আরও বলেন, প্রাচীরের উচ্চতা এমন হওয়া দরকার— যাতে ওরা ডিঙিয়ে আসতে না পারে এবং এতখানি চওড়া হওয়া দরকার যাতে একটি ঘোড় সওয়ার প্রাচীরের উপর দিয়ে অক্লেশে ছুটে যেতে পারে। কিছুদূর অন্তর অন্তর প্রাচীরের উপর এক একটা চৌকি তৈরি করতে হবে এবং প্রত্যেকটি চৌকিতে থাকবে সৈন্যসামন্ত এবং পর্যবেক্ষক দল।

রাজার এই বিশাল পরিকল্পনা রূপায়িত হতে প্রায় পনের বছর সময় লেগেছিল। কিন্তু কিছুকাল পরে বিদেশীরা প্রাচীরের কোন কোন অংশকে ভেঙে দিয়েছিল। পুনরায় সেই ভগ্ন অংশগুলোকে সংস্কার করাও হয়েছিল। অপরদিকে বারবার সারাতে হয়েছিল প্রাচীরকে। তা সত্ত্বেও মোঙ্গলরা সুযোগ পেলে বারেবারে আক্রমণ চালাতো। অবশেষে প্রাচীরের কিছু কিছু অংশ একেবারে ভেঙেই পড়েছিল এবং তাকে পুনরায় সংস্কার করা সম্ভব হয়নি। সেই ভাঙা অংশ দিয়ে মোঙ্গলরা মাঝে মাঝে চীনের ভূখণ্ডে প্রবেশ করতো।

আরও পরের দিকে চীনের প্রাচীর ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায় এবং চীনেরই কৃষকরা প্রাচীরের তলদেশে গাছগাছড়া লাগায় এবং চাষবাসও শুরু করে। তবু প্রাচীরটি বহুকাল বিদেশীদের আক্রমণে বাধা দিয়েছিল। প্রাচীর পেরিয়ে যাযাবর জাতিরা চীনে প্রবেশ করতে সাহস পায়নি।

চীনের প্রাচীর পৃথিবীর দীর্ঘতম প্রাচীর। লম্বায় ১৫০০ মাইল। মাটি, ইট ও পাথর দিয়ে তৈরি হয়েছিল। প্রাচীরের উপরটা চার মিটারেরর মত চওড়া ছিল। সেকালে এক দর্শনীয় বস্তু ছিল প্রাচীরটি এবং বহুলোকে দেখতে আসতো। বর্তমানে প্রাচীরের কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। অধিকাংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা

মনে হয় মানব সভ্যতার পত্তনের পূর্ব পর্যন্ত মানুষের মনে ঈশ্বরচিন্তা দানা বাঁধেনি। ঈশ্বরচিন্তার কোন অবসরও ছিল না বলা যায়। দীর্ঘকাল তো মানুষ পশুর পর্যায়ে ছিল। জীবনে নিরাপত্তা আদৌ ছিল না।

মানুষের মুখে কথা আসার পরে গুহাবাসের শেষের দিকেও সম্ভবত ঈশ্বরের

ভাবনা ভাবেনি। তবে কিছু কিছু অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। কিছু কিছু তুকতাক এবং সংস্কারের বশীভূত হয়েছিল। গুহা ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর আরও সংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ঈশ্বর ভাবনা তখনও ছিল না।



ঈশ্বর চিন্তা আরও পরের ঘটনা। নগর সভ্যতার পত্তন হলে মানুষের জীবনে নিরাপত্তা আসে এবং তখনই চিন্তাশীলরা কিছু কিছু চিন্তা-ভাবনার অবকাশ পান। নৈসর্গিক শক্তিগুলোর মধ্যেই ঐশীশক্তির সন্ধান করেন। ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মূলে মনে করা হলো ঈশ্বরের রোষ। আকাশের সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন ধারণা না থাকায় তাদেরও মহান দেবতারূপে গণ্য করে। অগ্নি, বায়ু, জল ইত্যাদির উপরও দেবত্ব আরোপিত হয়। ফলে সেকালে সমস্ত জাতিই বহু দেবতার কল্পনা করেছিল। মিশরীয়, ব্যাবলনীয়, আমিরীয়, গ্রীক, কেল্টিক, ভারতীয় প্রভৃতি সব প্রাচীন জাতিই বহু দেবতার উপাসক হয়ে উঠেছিলেন। সূর্যদেবতা, চন্দ্রদেবতা, বায়ুদেবতা, অগ্নিদেবতা, জলদেবতা প্রভৃতি কত দেবতা। সেকালে ভারতীয়রা নারীদেবতার কল্পনা মনে হয় করেনি। কিন্তু মিশর, গ্রীস প্রভৃতি দেশ নারীদেবতারও কল্পনা করেছিল।

দেবতাদের রাজারও কল্পনা করা হয়েছিল। যেমন গ্রীকদের জিউস এবং ভারতীয় ভাবনায় দেবরাজ ইন্দ্র। অপরদিকে সর্বশক্তিমান এক দেবতারও কল্পনা করেছিলেন সেদিনের কোন কোন দেশ। প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীগুলোতে দেখা যায়, দেবতাদেরও দুঃখ দুর্দশার মধ্যে পড়তে হতো এবং তখন তাকে শরণাপন্ন হতে হতো সর্বশক্তিমান সেই দেবতার কাছে। তিনিই বিপদ থেকে রক্ষা করতেন। ভারতে সর্বশক্তিমান তিন দেবতার কথা পুরাণে উল্লেখ আছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর।

বহু ঈশ্বরবাদ থেকে একেবারে পরের দিকে একেশ্বরবাদ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। হয়ত সর্বশক্তিমান কোন একজন দেবতার কল্পনা থেকেই একেশ্বরবাদের সূচনা।

বিদেশ স্বীকার না করলেও একেশ্বরবাদের প্রথম কল্পনা ভারতের। একেশ্বরবাদ উপনিষদেই স্থান পেয়েছিল। উপনিষদের ব্রহ্মবাদ যাকে বলা হয়।

উপনিষদ ভারতীয় দর্শন। দার্শনিক তত্ত্বসমূহকে সাঙ্কেতিক ভাষায় অথবা ছোট ছোট উপাখ্যানের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ ছাড়া উপনিষদে আত্মবিদ্যাও আলোচিত হয়েছে। বলা হয়েছে আত্মাই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এবং আত্মবিদ্যাই ব্রহ্মবিদ্যা। পরেরদিকে উপনিষদকে অবলম্বন করে অদ্বৈতবাদ ইত্যাদির উদ্ভব হয়। উপনিষদের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করার জন্য বহু দার্শনিক বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ব্যাসদেবের শ্রীমদ্ভগবদগীতা তাদের মধ্যে অন্যতম। শ্রীকৃষ্ণকেই সর্বশক্তির মূল আধার ধরা হয়েছে। সমগ্র বিশ্বজগৎ তাঁর থেকেই উৎপন্ন এবং তাঁর কাছেই লয়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয় যে, ভারতের উপনিষদ পাশ্চাত্যের চিন্তাজগতেও এককালে আলোড়ন তুলেছিল। এর প্রথম পারসিক সংকলন প্রকাশ করেছিলেন সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারাশিকোহ ১৬৫৬ খ্রীস্টাব্দে। এটি ১৮০১ খ্রীস্টাব্দের দিকে লাতিন ভাষায় অনুদিত হয়েছিল। অনুবাদ করেছিলেন আঁকেতিল দ্যুপোঁর। ঐ অনুবাদটি পাঠ করে জার্মান দার্শনিক শোপেন হাওয়ার বলেছিলেন উপনিষদই তাঁর জীবন ও মৃত্যুর একমাত্র সান্ত্বনা। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বহু বিদেশী দার্শনিক—ম্যাক্সমূলার, ডয়সেন, কোলব্রুক, বার্নেট, অলডেন্‌বার্গ প্রভৃতি উপনিষদের জার্মান ও ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন এবং এর ভূয়সী প্রশংসাও করেন। উপনিষদের রচনাকাল বেদ রচনার পরে এবং একে বেদের শেষ অংশ বলে ধরা হয়। খ্রীস্ট জন্মের অন্ততঃ দু'হাজার বছর আগে উপনিষদ রচিত হয়েছিল।

খ্রীস্টজন্মের প্রায় ১৩০০ বছর আগেও মিশরে একেশ্বরবাদের কল্পনা হয়েছিল। তারপর খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে পারস্যে একেশ্বরবাদ প্রচার করেন মহর্ষি জরথুশত্র। অনেকে মনে করেন ভারতীয় উপনিষদ তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। উপনিষদের "ব্রহ্ম" এবং জরথুশত্রের "আহুর মজদা" এক বলে মনে করা হয়। সেকালে পারস্যে তিনি প্রচার করেছিলেন একেশ্বরবাদ। তারপর ঈশ্বরপুত্র যীশু এবং হজরত মহম্মদ একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। ভগবান বুদ্ধ কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে একরকম নির্বিকার ছিলেন। তাই বুদ্ধ দর্শনকে ভারত "নাস্তিক্যদর্শন" আখ্যা প্রদান করেছে।

পৃথিবীর অধিকাংশ জাতি বর্তমানে একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। ভারতীয়দের মধ্যে বহু দেবতার অর্চনা এখনও চলে আসছে। অথচ এককালে পৃথিবীর সব সভ্যদেশই বহু দেবতার অর্চনা করতেন।

এনসাইক্লোপিডিয়া ও ডিক্সনারি

এনসাইক্লোপিডিয়া হচ্ছে সমস্ত বিষয়ের উপর জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ। আমরা সাধারণতঃ জ্ঞানকোষ বলি। এর আদর প্রথম থেকেই। বর্তমানে জ্ঞানকোষ আবার

শিক্ষার্থীদের অতি প্রিয় গ্রন্থ। প্রত্যেকেই হাতের কাছে রাখতে চান। কিন্তু সংগ্রহ করা অনেকের সাধ্যের বাহিরে।

প্রথমে উল্লেখ করতে হয় যে, এনসাইক্লোপিডিয়া ও ডিক্সনারী তথা জ্ঞানকোষ ও শব্দকোষ এক নয়। সর্ববিষয়ের এবং বিষয়সূচীর উপর বিস্তৃত আলোচনাই জ্ঞানকোষের অন্তর্ভুক্ত। এটি গ্রীক শব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে। যার অর্থ সর্ববিষয় ও সর্বতথ্যের পরিচিতি। এনসাইক্লোপিডিয়া শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন স্যার টমাস এলিয়ট নামে এক ইংরাজ ভদ্রলোক ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দে। তিনি উল্লেখ করেছিলেন বিজ্ঞানসহ সমূহ শিক্ষণীয় বিষয়গুলির বোঝানোর সহজ গ্রন্থ।

বর্তমানে এন সাইক্লোপিডিয়ার বিষয়সূচি সাজানো হয় বর্ণানুক্রমিক। যিনি যে বিষয়টি সম্বন্ধে জানতে চান, তিনি বিষয়ের প্রথম বর্ণকে নিয়ে অনুসন্ধান করেন। কাজটা সহজ হয়। কিন্তু মধ্যযুগে ইওরোপে যেসব জ্ঞানকোষ রচিত হয়েছিল সেগুলোর বিষয়বস্তুকে বর্ণানুক্রমিক সাজানো হতো না। প্রথমে দেবদেবীর কথা ও দেবদূতের কথা থাকতো এবং পরে দেওয়া হতো অন্যান্য কথা।

প্রকৃতপক্ষে এনসাইক্লোপিডিয়ার প্রথম রচয়িতা মহাত্মা প্লিনি। ইনি রোমের অধিবাসী ছিলেন। একাধারে ছিলেন সাহিত্যিক, দার্শনিক বিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্রাচীন আবিস্কারাবলীকে লিপিবদ্ধ করার জন্য বহু শ্রমে রচনা করেছিলেন গ্রন্থটি। নাম ছিল "ন্যাচারেল হিস্ট্রি"। তিনি তৎকালে প্রচলিত ৪৫০ খানা বই-এর সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। ৩৭ খণ্ডে বিভক্ত ছিল বইটি এবং আলোচ্য বিষয়ের সংখ্যা ছিল বিশ হাজার। ১৫৩৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত একমাত্র এই বইটিই জ্ঞানকোষরূপে আদৃত হয়েছিল এব ৪৩ বার বইটি ছাপা হয়েছিল। ইওরোপে রেনাসাঁসের যুগে এই বইটির অবদান ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

চীনদেশেও এনসাইক্লোপিডিয়া রচিত হয়েছিল। ১৭১০ খ্রীস্টাব্দের দিকে তৎকালীন চীন সম্রাটের নির্দেশে রচিত হয়েছিল বিশাল এক এনসাইক্লোপিডিয়া। সেটি ৫০২০ খণ্ডে বিভক্ত ছিল এবং চীনাদের রচিত সেকালের এই এনসাইক্লোপিডিয়াই ছিল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় গ্রন্থ। তবে এটিকে বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়নি।

বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো এনসাইক্লোপিডিয়া প্রথম রচনা করেন একজন ইংরাজ ধর্মযাজক। নাম তাঁর জন হ্যারিস। প্রকাশিত হয়েছিল ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দে এবং এটিকে বলা হয় 'ইউনিভারসাল ইংলিশ ডিক্সনারি অব্ আর্টস অ্যাণ্ড সায়েন্স"।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসীরাও রচনা করেছিলেন এনসাইক্লোপিডিয়া। নাম "এনসাইক্লোপিডি"। রচনার কাজ শুরু হয়েছিল ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দে। তবে এতে তাঁদের দেশের নামকরা ব্যক্তিদের জীবনী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। রুসো, ভলতেয়ার প্রভৃতিদের। অন্যান্য দেশের চিন্তানায়কদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি।

পৃথিবীর বিখ্যাত এনসাইক্লোপিডিয়া "এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা বা ডিক্সনারী

অব্ আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস"। প্রথম রচনা শুরু হয়েছিল ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে স্কটল্যান্ডে। এটিকে প্রকাশ করেছিল ব্রিটিশ যুক্তরাষ্ট্র ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে। বর্তমানে এইটিই বিশ্বের বৃহত্তম এনসাইক্লোপিডিয়া এবং এর জনপ্রিয়তা সারা পৃথিবীতে ধীরে ধীরে বাড়ছে।

ভারতও প্রাচীনকালে জ্ঞানকোষ তথা বিবিধবিদ্যার সংগ্রহের কথা চিন্তা করেছিল। প্রথম অবশ্য ভারতে জ্ঞানকোষ রচিত হয়নি। হয়েছিল শব্দকোষ বা অভিধান। সংস্কৃতেই রচিত হয়েছিল। সবচেয়ে প্রাচীন ও বিখ্যাত শব্দকোষ অমরসিংহের "নামলিঙ্গানুশাসন"। এটি একাধারে অভিধান এবং জ্ঞানকোষ। অমরসিং বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন ছিলেন। তাঁর কোষগ্রন্থটি "অমরকোষ" নামে এখনও প্রসিদ্ধ।

সংস্কৃতে লেখা প্রকৃত জ্ঞানকোষ রচিত হয়েছিল খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে। চালুক্য বংশীয় রাজা ভূলোকমল্ল পণ্ডিতদের নিয়োগ করেছিলেন জ্ঞানকোষ রচনার জন্য। সেটির নাম ছিল "মানসোল্লাস"। সংস্কৃতে কালে কালে বহু অভিধান রচিত হলেও জ্ঞানকোষের মর্যাদা পেয়েছে মানসোল্লাস। প্রধানত এটি ছিল সাহিত্যকোষ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বাংলায় এনসাইক্লোপিডিয়া রচনার জন্য চেষ্টা করা হয়। প্রথম হস্তক্ষেপ করেছিলেন ফেলিক্স কেরি। জাতিতে ইংরাজ। নামকরণ করেছিলেন "বিদ্যাহারাবলী"। কিন্তু এটিকে শেষ করতে পারেননি। মাত্র একটি খণ্ড ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশ করেছিলেন। তারপরে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন গঙ্গোপাধ্যায় "এনসাইক্লোপিডিয়া বেঙ্গলিন্সিজ" নামে দ্বিভাষীয় জ্ঞানকোষ রচনা করেন। মোট তের খণ্ডে সম্পূর্ণ এবং প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। পণ্ডিতদের মতে এটি পূর্ণাঙ্গ এনসাইক্লোপিডিয়া নয়। বাংলা ভাষায় যথার্থ জ্ঞানকোষ প্রথম রচনা করেন নগেন্দ্রনাথ বসু। নাম বিশ্বকোষ। ২২ খণ্ডে সম্পূর্ণ এই গ্রন্থের প্রকাশকাল বাংলা ১২৯৩ সাল থেকে ১৩১৮ সাল।

প্রসঙ্গক্রমে অভিধান বা ডিক্সনারির কথাও কিছু বলতে হয়। আমরা অভিধানের পরিবর্তে ডিক্সনারি কথাটাই অধিক ব্যবহার করি। এর ব্যাপক প্রচলন ছিল প্রাচীন ভারতবর্ষে এবং সেকথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

ডিক্সনারি শব্দটি ইংরেজি। লাতিন ডিক্সনারিয়াস (Dictionarius) শব্দ থেকে নেওয়া। অর্থ শব্দসংগ্রহ (a collection of words)। আমাদের দেশের শব্দকোষ সমার্থক।

ইংরেজিতেও অভিধান অনেক আগেই রচিত হয়েছিল বিভিন্ন নামে। ডিক্সনারি শব্দটি ১২২৫ খ্রীস্টাব্দে প্রথম ব্যবহার করেন "জন গারল্যান্ড" নামে জনৈক ইংরাজ ভদ্রলোক। মূলত লাতিন শব্দগুলোকেই একত্রিত করা হয়েছিল। তারপর প্রায় ৩০০ বছর ধরে চলে এসেছিল প্রায় একই ধারা। অর্থাৎ সেকালে ডিক্সনারী বলতে লাতিন শিক্ষার বই হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল।

প্রকৃত ইংরাজি অভিধানের সূচনা হয় ১৫৫২ খ্রীস্টাব্দে। রচনা করেন রিচার্ড হিউলোয়েট। নাম দিয়েছিলেন "Abcedarium Anglico Latinum Pro Tyrunculis"। বিরাট নাম। নাম থেকে বোঝা যায়, এটি লাতিন শব্দকোষ। তবে শব্দগুলো ছিল ইংরেজি এবং ইংরেজিতেই বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। পরে যুক্ত করা হয়েছিল লাতিন অনুবাদ। বইটিতে ছাব্বিশ হাজার শব্দকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিল যথেষ্ট।

অতঃপর বহু ইংরেজি শব্দের প্রবর্তন হয় এবং ইংরেজি শব্দভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ হয়। সেইসব শব্দকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন হওয়ায় ১৬২৩ খ্রীস্টাব্দে Henry Cockeram নামে এক ইংরাজ রচনা করেন "The English Dictionairie"।

সর্বাধিক প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল ওয়েবস্টারের ডিক্সনারি। ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশ করতে সময় লেগেছিল। এতে স্থান পেয়েছিল বার হাজার শব্দ এবং চল্লিশ হাজার বিশ্লেষণ। এটি জ্ঞানকোষের সমতুল বলা যায়। শব্দগুলোর বেশ সহজ অর্থও প্রদান করেছিলেন ওয়েবস্টার।

ভারতে প্রাচীনকাল থেকে এ পর্যন্ত অসংখ্য অভিধান রচিত হয়েছে। অমরকোষের পর হলায়ুধ দশম শতাব্দীতে রচনা করেছিলেন অভিধানরত্নমালা। এটিও সংস্কৃতে লেখা উল্লেখযোগ্য অভিধান। আধুনিক রীতিতে সংস্কৃত অভিধান রচিত হয়েছে মহারাজা রাধাকান্ত দেবের উদ্যোগে শব্দকল্পদ্রুম। রচনাকাল ১৮২২ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে।

বাংলা ভাষায় অভিধান রচিত হয়েছে ইওরোপীয় রীতিতে। প্রথম বাংলা শব্দকোষ পর্তুগীজ "মনোএল দা আসসুম্পসাম" রচনা করেন। এটি পর্তুগীজ-বাংলা শব্দকোষ। ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দে লিসবনে ছাপা হয়েছিল। তারপর রামকমল সেন ইংরেজি বাংলা অভিধান রচনা করেন ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে। বাংলা তৎসম শব্দের প্রথম ভাল অভিধান রামকমল বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্যের "প্রকৃতিবাদ অভিধান"। বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির বাংলা শব্দকোষ। এর চারটি খণ্ড ১৩২০ থেকে ১৩২২ বঙ্গাব্দের মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

ব্যাঙ্ক পরিষেবা

বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্রই ব্যাঙ্ক পরিষেবা চালু হয়েছে। অতি সাধারণ ও দরিদ্র থেকে ধনী পর্যন্ত সবাই কোন না কোন ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত আছেন। অর্থকে নিরাপদে গচ্ছিত রাখা এবং প্রয়োজন মত টাকা গ্রহণ করা, অল্প সুদে ঋণ গ্রহণ ইত্যাদির জন্য ব্যাঙ্ক ছাড়া উপায় নেই কারও। বর্তমানে ব্যাঙ্ক পরিষেবার অনেক উন্নতি হয়েছে। সুবিধে হয়েছে যন্ত্রগণকের আমদানি হওয়ায়। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এমন কিছু কিছু ব্যাঙ্ক আছে, যারা দিবারাত্রি পরিষেবা চালু রাখে। এককথায় আজকের দিনে

কৃষক থেকে ছোটবড় ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী সবারই ব্যাঙ্কের শরণাপন্ন হতে হয়। মানব সভ্যতার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের অবদানও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

মনে হতে পারে ব্যাঙ্কের ধারণাটা কবে, কোথায় এবং প্রথমে কার কিংবা কাদের মাথায় এসেছিল? ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখলে সুদ দেওয়ার পদ্ধতি বা কবে প্রচলিত হয়েছিল?

ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়ার আগে মানুষ সুদের কারবার করতো। যাদের অর্থ থাকতো তারা মানুষের বিপদে আপদে টাকা ধার দিতো। সুদের হার ছিল অত্যন্ত চড়া। একবার সুদখোরদের খপ্পরে পড়লে এবং সুদসমেত টাকা পরিশোধ করতে না পারলে সর্বস্বান্ত হতে হতো ঋণগ্রহণকারীকে। মাত্র কিছুকাল আগে পর্যন্তও আমাদের দেশের দরিদ্র কৃষিজীবীরা মহাজন তথা সুদখোরদের উৎপীড়নে জর্জরিত হতেন এবং অনেকে নিজ ভদ্রাসনটুকুও বজায় রাখতে পারবেন না। দেশে ব্যাঙ্ক পরিষেবা চালু হওয়ায় সে পথ অনেকটা বন্ধ হয়েছে।

শুধু আমাদের দেশে নয়, সব দেশেই এই ঘটনা ঘটতো। সেক্সপীয়রের লেখা "মার্চেন্ট অব্ ভেনিস" নাটকটি তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ।



ব্যাঙ্ক পরিষেবার উদ্ভব কিন্তু আজকের দিনের ঘটনা নয়। বহু প্রাচীন ব্যবস্থা। কিন্তু জনপ্রিয়তা ছিল না আদৌ। অনেকে মনে করেন, সেই সুদূর অতীতে ব্যাবিলনে, মিশরে এবং গ্রীসে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে অর্থ লেনদেন চালু হয়েছিল। সেদিন দসু তস্করের ভয় ছিল। মানুষ ঘরে টাকা পয়সা জমিয়ে রাখতে পারতো না। তাই ব্যাঙ্কে জমা রাখতো। কিন্তু ঐ টাকাব জন্য কোন সুদ প্রদান করা হতো না। সাধারণত মন্দিরেই টাকা রাখা হতো। অর্থাৎ অর্থবানরা টাকা মন্দিরে গচ্ছিত রাখতেন। সেকালের প্রতিটি

মন্দিরই ছিল এক একটি ধনাগার। হয়ত ভারতেও এই ব্যবস্থা ছিল। তার প্রধান উদাহরণ গুজরাটের সোমনাথ মন্দির। সেখানে বহুজনে বহু স্বর্ণ ও স্বর্ণমুদ্রা গচ্ছিত রেখেছিলেন। সুলতান মামুদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়েছিল।

খ্রীস্টজন্মের দুশ বছর আগে পর্যন্ত ব্যাঙ্ক স্থাপন ও পরিচালনার জন্য কোন সংস্থা গড়ে উঠেনি। কোন দেশের কোন রাজাও এদিকে দৃষ্টি দেননি। ২১০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে সর্বপ্রথম রোমই এক নির্দেশ জারি করে। ঐ নির্দেশ অনুযায়ী যারা অর্থ লেনদেন করবেন তাদের একটি সংস্থা গঠন করতে হবে এবং কয়েকটা নিয়ম পালন করতে হবে। অবশ্য ব্যাঙ্ক নামটাই চালু হয়নি তখন। এখানে ওখানে অর্থ বিনিময় করা হতো। বিনিময়কারীরা অর্থ গ্রহণ করতেন এবং প্রয়োজনে অর্থ প্রদান করতেন।

''ব্যাঙ্ক'' কথাটি ইতালীয় শব্দ থেকে এসেছে। মধ্যযুগে ইতালিতে অর্থ বিনিময়কারী অনেকে ছিলেন। তাঁরা বড় রাস্তার পাশে একটি বেঞ্চের উপর বসে ব্যবসা চালাতেন। বেঞ্চকে ইতালি ভাষায় বলে ব্যাংকো। ঐ ব্যাংকো শব্দটি থেকে ব্যাঙ্ক কথাটির উৎপত্তি।

আধুনিক ব্যাঙ্ক পরিষেবার সূচনা ১৫৮৭ খ্রীস্টাব্দে ভেনিসে বলে মনে করা হয়। স্থাপন করা হয়েছিল ব্যাংকো দ্য রিয়ালটো। তারাই প্রথম টাকা জমাকারীদের চেক দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করে। ১৬১৯ খ্রীস্টাব্দের দিকে ঐ ভেনিসেই ব্যাংকো ডেল জিরো সোনা রূপা জমা রেখে তার পরিবর্তে অর্থ প্রদান শুরু করে। ইংলন্ডে ব্যাঙ্ক পারিষেবা চালু হয়েছিল ১৬৯৪ খ্রীস্টাব্দের দিকে। স্থাপিত হয় ''ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ড''। তারপর ধীরে ধীরে পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশেও ব্যবস্থাটা ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমের দিকে সব ব্যাঙ্কই ছিল প্রাইভেট সংস্থা। পরে সব দেশেই ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রায়ত্তকরণ করে। তবে প্রাইভেট সংস্থা বর্তমানেও কিছু কম নেই। টাকা লেনদেনের এই মাধ্যমগুলোকে বিশেষ কতকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হয় এবং সরকারি হস্তক্ষেপ থাকে।

চিকিৎসাবিদ্যার গোড়ার কথা

কথায় বলে, শরীর ব্যাধিব মন্দির। এখন আমরা জেনেছি, ব্যাধির মূলে আছে নানা ধরনের জীবাণু, ভাইরাস প্রভৃতি। এরা পৃথিবীর বুকেই প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল এবং এখনও সমানে চালাচ্ছে তাদের বংশবিস্তার। বংশবিস্তার করে উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহকে অবলম্বন করে। সবাই কিন্তু সব প্রাণী বা উদ্ভিদদেহকে অবলম্বন করে বংশবিস্তার করতে পারে না। এদের দাপট সেই প্রাচীনকাল থেকে আজও পর্যন্ত অব্যাহত। তাই যেকোন উদ্ভিদ এবং যেকোন প্রাণীকে রোগাক্রান্ত হতে হয।

অতি প্রাচীনকালে মানুষ জানতো না রোগের কারণ। রোগাক্রান্ত হলে মানুষ

মারা যেতো। তবে প্রাচীন মানবগোষ্ঠীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আজকের মানুষের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। তথাপি অনেকে রোগাক্রান্ত হতো এবং মারাও যেতো।

মৃত্যু অতীব শোকাবহ ঘটনা। জন্ম যখন হয়েছে মৃত্যু একদিন অবশ্যই হবে। এ-কথাটা অতি প্রাচীনকালেই মানুষ সম্ভবত টের পেয়েছিল। তথাপি উন্নত মস্তিষ্কের অধিকারী হওয়ার জন্য আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু তাদের প্রাণে চরম ব্যথার সৃষ্টি করতো। তাই খুঁজেছিল রোগব্যাধি থেকে মুক্তির উপায়।

প্রথম প্রথম চিকিৎসা পদ্ধতি আদৌ বিজ্ঞানসম্মত ছিল না। অসুখ সম্বন্ধে বিভিন্ন সংস্কার ছিল মানুষের। এমনকি নগর সভ্যতার যুগেও। যদিও কিছু কিছু ভেষজের সন্ধান পেয়েছিল তবু মনে করতো শরীরে অশুভ কোন শক্তি প্রবেশ করলেই অসুখ হয়। মিশরীয়রা মনে করতো, শরীরে অশুভ আত্মা প্রবেশ করলেই রোগ হয়। সেই কারণে প্রথমে রোগ তাড়াবার জন্য নানা ধরনের তুকতাকের প্রচলন হয়েছিল। সমাজে এক একজন মানুষ থাকতো—যারা নানা ধরনের তুকতাক করতো। আজকের ওঝা বা গুনীনদের মত। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে এর প্রচলন আজও বহুলভাবে লক্ষ্য করা যায়। সেকালের ওঝারা ঝাঁড়ফুঁক, মন্ত্র-তন্ত্র ইত্যাদির সাহায্য যেমন গ্রহণ করতো তেমনই কিছু কিছু গাছের পাতা ও শেকড়ও ব্যবহার করতো। গাছের পাতা, শেকড় বাকড় পুড়িয়ে ধোঁয়াও ব্যবহার করতো। মনে হয় ভেষজের সন্ধান প্রথম ঐ ওঝারাই করেছিল।

ওঝারা তুকতাক করার জন্য নানা ধরনের সাজসজ্জাও গ্রহণ করতো। মুখে রঙ মাখতো, চিত্রবিচিত্র করতো শরীরকে। কৃত্রিম শিং, লেজ প্রভৃতি যুক্ত করতো। হাতের কাছে পশুর শিং, মানুষের মাথার খুলি ও হাড় ইত্যাদি মজুত রাখতো। চিকিৎসা নয়, ভোজবিদ্যাই প্রদর্শন করতো বেশি।

পরের দিকে মানুষ এমন কিছু কিছু উদ্ভিদের সন্ধান পেয়েছিল—যেগুলোর পাতা শেকড় প্রভৃতি কিছু কিছু রোগের উপশম ঘটায়। আরও পরের দিকে অসুখ করলে তুকতাকের সঙ্গে কিছু ওষুধও ব্যবহার করতে শেখে। ওষুধগুলোর মধ্যে প্রধান ছিল মধু, কোন কোন গাছের পাতার রস ও তেল, লবণ ইত্যাদি।

কথিত আছে পাশ্চাত্যে গ্রীকদের আমলেই বিজ্ঞানসম্মতভাবে চিকিৎসা পদ্ধতির প্রচলন হয়। শব ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে তাঁরা মানবশরীর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতেন। তাঁরা বহু গাছ-গাছড়ার ভেষজগুণও আবিষ্কার করেছিলেন এবং ব্যাধির কারণ সম্বন্ধেও আলোকপাত করেছিলেন। বিজ্ঞানসম্মতভাবে চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিলেন হিপোক্রাতেশ। তাঁকেই বলা হয় চিকিৎসাবিদ্যার জনক। চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। হাজার বছরেরও অধিকাল পাশ্চাত্যে হিপোক্রাতেশের গ্রন্থগুলিই ছিল চিকিৎসকদের একমাত্র অবলম্বন।

হিপোক্রাতেশের অনেক পূর্বে ভারতে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা পদ্ধতির কিন্তু উদ্ভব হয়েছিল। সম্ভবতঃ বৈদিক যুগে হিপোক্রাতেশের (খ্রীঃ পূঃ ৪৬০-৩৭৭) আবির্ভাবের অন্ততঃ পাঁচশ বছর আগে মানুষের রোগের কারণ ও রোগ নিরাময়ের উপায় বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করেছিল ভারতীয় আয়ুর্বেদাচার্যরা। রচিত হয়েছিল শারীরবিদ্যার পুস্তকও। সেকালেও ভারতীয় চিকিৎসকদের শব ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে মানব শরীর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে হতো। শরীরের রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থা, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি সম্বন্ধেও আবিষ্কৃত হয়েছিল উল্লেখযোগ্য তথ্য। দু'ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতির প্রচলন হয়েছিল। কায়চিকিৎসা ও শল্যচিকিৎসা।

প্রাচীন ভারত বহু ভেষজ আবিষ্কার করেছিল। গ্রীকদের অপেক্ষাও বেশি। কিন্তু সেকালের ভারতীয় পণ্ডিতরা একটু ভুল করেছিলেন। সেইসব গাছ-গাছড়া সম্বন্ধে কোন পুস্তক রচনা করেননি বা গাছের চিত্রও অঙ্কন করতে চেষ্টা করেননি। পরের দিকে ঐ কারণে অনেক ভেষজ হারিয়ে গেছে। অঞ্চলভেদে গাছ-গাছড়ার নাম ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় প্রকৃত নামও আজ অনেকটা বির্তকের বিষয় হয়ে পড়েছে। গ্রীকরা কিন্তু তা করেননি। গাছ-গাছড়ার নামও সেই সঙ্গে গাছের ছবি, ফুল, ফল ইত্যাদির অঙ্কন করেছিলেন।

শল্যচিকিৎসা

শল্যচিকিৎসা বা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে রোগীর চিকিৎসা প্রথমে ভারতেই প্রবর্তিত হয়েছিল। সম্ভবত খ্রীস্টজন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে। ''শল্য চিকিৎসা'' ভারতীয় নাম। শল্য শব্দের অর্থ তীর। যুদ্ধে তীরবিদ্ধ সৈনিকের দেহ থেকে তীরকে বের করে আনা এবং চিকিৎসার মাধ্যমে ক্ষতকে নিরাময় করানোর পদ্ধতি ছিল এই চিকিৎসার বিষয়। পরেরদিকে অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়। ফোঁড়া বা ক্ষত বিষিয়ে উঠলে অস্ত্রোপ্রচারের মাধ্যমে রক্ত পুঁজ বার করাও এই চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এই চিকিৎসার প্রকৃত প্রবর্তক কে তা সঠিকভাবে জানা যায় না। ভাবতে সুপ্রাচীন যে শল্যচিকিৎসার বই পাওয়া গেছে সেটির নাম সুশ্রুত সংহিতা। বইটি এখনও অবলুপ্ত হয়নি। রচনা করেছিলেন বিশ্বামিত্র পুত্র সুশ্রুত। পুরাণ বর্ণিত মহর্ষি বিশ্বামিত্র কিনা কে জানে? সুশ্রুতের গুরুর নাম ধন্বন্তরি। ধন্বন্তরি সম্বন্ধেও ভারতে বহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কিংবদন্তী ভেদ করে ধন্বন্তরির প্রকৃত পরিচয় লাভ বর্তমানে একরকম অসম্ভব।

যাইহোক, খ্রীস্টজন্মের অন্ততঃ ৬০০ বছর আগে সুশ্রুত আবির্ভূত হয়েছিলেন।

সুশ্রুত সংহিতা বর্তমান কালেরও এক বিস্ময়। এমন বিজ্ঞানসম্মত অস্ত্রোপচার যেন বিশ্বাসই করা যায় না। সুশ্রুত সংহিতা থেকে জানা গেছে, শল্যচিকিৎসার জন্য নানা ধরনের ধারালো অস্ত্র সে যুগেও ভারত আবিষ্কার করেছিল। সেসব অস্ত্রের অধিকাংশকে এখনও শল্যচিকিৎসকরা ব্যবহার করে থাকেন। নানা ধরনের ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি। শতাধিক অস্ত্র সে সময় ব্যবহার করা হতো। চৌদ্দ রকমের ব্যান্ডেজেরও ব্যবহার করা হতো। দেহের কোন জায়গার হাড় ভেঙে গেলে বা স্থানচ্যুত হলে কাঠের ফলক দিয়ে বেঁধে দেওয়া হতো। উদরী রোগে রোগীর তলপেট ছিদ্র করে জল বার করে দেওয়া হতো। পঙ্গু হাত ও পাকে কেটে বাদ দেওয়ার পদ্ধতিও উদ্ভাবিত হয়েছিল।

পুনর্গাঠনিক শল্যচিকিৎসা তথা প্লাস্টিক সার্জারির কথাও উল্লেখ আছে সুশ্রুত সংহিতায়। যুদ্ধে নাক কিংবা কান কাটা গেলে তাকে পুনর্গঠন করা হতো এবং এই পদ্ধতি ভারতে দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। পাশ্চাত্যে সুশ্রুত সংহিতার বৈশিষ্ট্য অনেক পরে স্বীকার করেছে এবং স্বীকার করেছে প্লাস্টিক সার্জারি প্রথম ভারতেই উদ্ভব হয়েছিল। এই কারণে নাক ও কানের পুনর্গঠন পদ্ধতির নামকরণ করা হয়েছে ‘‘ইন্ডিয়ান রাইনো প্লাস্টি’’। চক্ষু অধিরোপন পদ্ধতিও নাকি সেকালে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল।

শল্যচিকিৎসার জনক সুশ্রুতই। চক্ষু এমনকি মস্তিষ্কেও তিনি অস্ত্রোপচার করতেন। তবে শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে রোগীকে অজ্ঞান করানোর পদ্ধতি সেকালে ছিল না বলে মনে হয়। কেউ কেউ মনে করেন, মদ প্রভৃতি খাইয়ে রোগীকে বেহুঁস করে ফেলার চেষ্টা হতো। সম্মোহন করার রীতিও প্রচলিত হয়েছিল এবং কিছু কিছু গ্যাস ও লতাগুল্মের রসও ব্যবহার করা হতো।

চুল কাটা ও নখ কাটা

গায়ের লোমকে সাধারণত বহিস্তকের বৃদ্ধি বলে ধরা হয়। পাখির পালক, মাছের আঁশ এই জাতীয়। এতে কোন স্নায়ু নেই। অপরদিকে হাত পায়ের নখ ও চামড়া থেকে উৎপন্ন এবং মৃতকোষের দ্বারা তৈরি। এতেও স্নায়ু নেই। ঐ কারণে চুল বা নখকে কাটলে আদৌ ব্যথা অনুভূত হয় না। অতি প্রাচীনকালেই মানুষ বুঝতে পেরেছিল নখ এবং চুল কাটলে ব্যথা অনুভূত হয় না।

আদিকালে মানুষ চুল এবং নখ কিছুই কাটতো না। যেমন হাতে ও পায়ে লম্বা লম্বা নখ ছিল তেমনই মাথায় থাকতো ঝাঁকড়া চুল। ক্রোম্যাগনন মানুষের আগমনের পূর্বে পুরুষদের মুখমণ্ডলে গোঁফদাড়িও বিশেষ গজাতো না। চোয়াল ছিল উঁচু—

অনেকটা বনমানুষের মত। তবে মাথা ভর্তি চুল থাকতো।

সেকালে মানুষ চুলের পরিচর্যাও করতো না। কী পুরুষ, কী নারী! হাতের নখ তাদের আত্মরক্ষার অন্যতম উপকরণও ছিল। দাঁত ও আত্মরক্ষার কাজে ব্যবহার করতো। প্রয়োজনে প্রতিপক্ষ মানুষ কিংবা পশু সবাইকে আঁচড়ে-কামড়ে অস্থির করে তুলতো। চামড়াও ছাড়াতো নখের সাহায্যে। ভারি অপরিষ্কার ছিল। গুহাকেও রাখতো অপরিচ্ছন্ন।

নব্যপ্রস্তর যুগে ক্রোম্যাগনন মানুষের আগমন হলে তারা কিছুটা সৌখিন হয়ে পড়ে। আজকের মানুষের পূর্বপুরুষ এরাই। মুখাবয়ব ছিল আধুনিক মানুষের মত। ফর্সা, লম্বা ও উন্নত নাসা। গোঁফ দাড়ি প্রকৃতপক্ষে ওদেরই পুরুষদের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছিল। তথাপি তারা চুলও কাটতো না, সম্ভবত নখও কাটতো না। তবে চুলের পরিচর্যা করতো। বিশেষ করে মেয়েরা। তারা পাথরের চিরুনি দিয়ে অথবা কোন কোন গাছের কাঁটাযুক্ত ফলের সাহায্যে মাথা আঁচড়াতো। কাঠের তৈরি মোটা চিরুনি বা কাঁকুইরও প্রচলন করেছিল সেই সময় এবং এই কাঁকুইর কাল বহুদিন অব্যাহত ছিল।

মানুষ চুলকে বাগ মানাবার প্রচেষ্টা চালায় ধাতু আবিষ্কারের পরে। চুল কাটা পাথরের অস্ত্র দিয়ে সম্ভব ছিল না। ছিল না কাঁচির ব্যবস্থা। লৌহযুগেই নানা ধরনের ধারালো অস্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল। তার প্রমাণ সুশ্রুত বর্ণিত মানবদেহে অস্ত্রোপচারের সরঞ্জাম। শুশ্রুত সংহিতায় উল্লেখ আছে, যাঁর অস্ত্র একটি চুলকেও লম্বালম্বিভাবে কেটে দুখানা করতে পারে তাঁর অস্ত্রই অস্ত্রোপচারের পক্ষে উপযুক্ত। অতএব চুলকাটার সরঞ্জাম খ্রীস্টজন্মের অন্ততঃ ছয় শত বছর আগে আবিষ্কৃত হয়েছিল। সেই থেকে চুল ও দাড়ি কামানোর চিন্তা মাথায় আসে। হয়ত অনেকে মাথার চুল কাটতো। তবে এই পদ্ধতি কবে যে শুরু হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলার কোন উপায় নেই।

নগর সভ্যতার যুগ শুরু হলেই মানুষের সৌখিনতা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে। প্রাচীনকালে আঁকা মিশরের ছবিগুলো দেখলে বোঝা যায় সেসময়ে পুরুষেরা চুলও কাটতেন এবং গোঁফদাড়িও কামাতেন। সেসময় মেয়েরা কিন্তু চুল কাটতেন না। তারও প্রমাণ সেই মিশরীয় ছবিগুলো। মেয়েরা লম্বা চুল রাখলেও চুলের পরিচর্যা করতো। তবে বহু পুরুষ মাথায় লম্বালম্বা চুলও রাখতেন। গোঁফদাড়িও অনেকে কামাতেন না। গ্রীক পণ্ডিতদের যেসব মূর্তি পাওয়া যায় তাতেও অনেকের মাথায় ঝাঁকড়া চুল ও গোঁফদাড়ি লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবত সেসময় মাথার চুলকে ভালভাবে বাগ মানিয়ে কোঁকড়াবার ব্যবস্থা হয়েছিল। পরের দিকে এই পদ্ধতির ব্যাপকভাবে প্রচলন হয়।

মেয়েদের মাথায় বড় চুল এবং পুরুষদের মাথায় ছোট চুল রাখার প্রথা একেবারে হাল আমলের ব্যাপার বলা যেতে পারে। মধ্যযুগে মহিলারা তো বটেই, পুরুষরাও মাথায় লম্বা চুল রাখতেন। ভালভাবে কোঁকড়ানোর ব্যবস্থা করতেন এবং চুলকে ফিতে দিয়ে বাঁধতেনও। যাঁদের চুল লম্বা হতো না তারা পরচুলাও পরিধান করতেন। এককথায় নারী ও পুরুষ উভয়ের মাথার চুলের বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যেতো না।

ইংলন্ডের রাজা অষ্টম হেনরি প্রথম নারী ও পুরুষের চুলের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশের জন্য একটা নির্দেশনামা জারি করেছিলেন। তিনি আদেশ জারি করেন, পুরুষদের মাথার চুল ছোট করতে হবে এবং লম্বা দাড়ি রাখতে হবে। গোঁফও থাকবে এবং গোঁফটাকে কুঁকড়ে বিন্যস্ত করতে হবে। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রথম জেমস পুরুষদের লম্বা চুলের রীতি ফিরিয়ে আনেন এবং চুল যথেষ্ট লম্বা নাহলে পরচুলা ব্যবহারেরও নির্দেশ দেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চুল সংক্রান্ত দুটি মতবাদ গড়ে উঠে। একদলের মতে পুরুষের মাথার চুল খাটো রাখা এবং দাড়িকে লম্বা করা এবং অপর দলের মতে লম্বা চুল এবং খাটো দাড়ি। এই বিতর্ক প্রায় একশ বছর চলে এসেছিল। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দেই পুরুষদের মাথার চুলকে খাটো করার রীতিই প্রতিষ্ঠিত হয়।

মহিলাদের মাথার লম্বা চুলের রীতি একরকম প্রথম থেকেই প্রচলিত ছিল। কোন বিতর্ক উঠেনি। একেবারে আধুনিককালেই মেয়েদের চুলকে বব করার রীতি প্রচলিত হয়েছে।

চুল কাটার জন্য প্রথম থেকে কিন্তু নাপিতের সাহায্য গ্রহণ করা হতো না। চুল কাটার জন্য সেলুন প্রথম ১৪৬১ খ্রীস্টাব্দে ইংলন্ডেই চালু হয়েছিল। তারপর ফ্রান্সে চতুর্দশ লুইর আমলে। এক্ষেত্রে নাপিতেরাই চুল কাটার পেশা গ্রহণ করেছিল। তার একটা কারণ আছে।

অনেক আগে থেকে সমাজে একদল মানুষ ছোটখাটো অপারেশন করায় দক্ষ হয়ে উঠেছিল এবং বংশ পরম্পরায় এই কাজ করতো। একটা ছোট বাক্সে ছুরি, কাঁচি, নরুন, সূচ ইত্যাদি নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। পায়ে কাঁটা ফুটলে বার করে দিতেন, ফোঁড়া চিরে পুঁজ ও রক্ত বার করে দিতেন এবং ব্যান্ডেজও বেঁধে দিতেন। তাঁরা এক ধরনের চিহ্নও হাতে নিতেন। একটা ছোট লাল ও শাদা রঙের খুঁটি। ঐ চিহ্নটি দেখলে যাঁদের অপারেশনের প্রয়োজন হতো তাঁরা কেবল সেই ব্যক্তিকে ডেকে আনতেন।

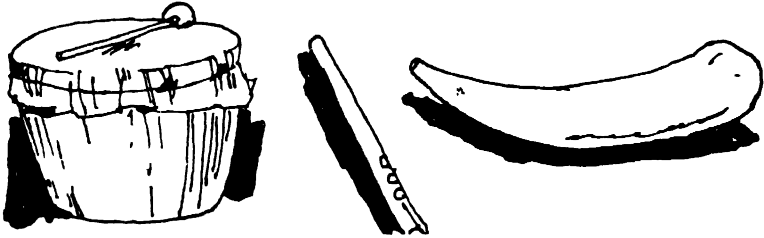
পরের দিকে অপারেশনের কাজে ওদের আর প্রয়োজন হয়নি। ওঁরা অধিকাংশই ছিলেন অশিক্ষিত এবং পেশাটা ছিল বংশানুক্রমিক। চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি ঘটলে

চিকিৎসকরা নিজেরাই ছোট বড় সব রকমের অপারেশন করতে শুরু করেন এবং এঁরা তখন বেকার হয়ে পড়েন। তখনই তাঁরা চুল কাটার প্রচলন শুরু করেন। এখনও কোন কোন নাপিতের সেলুনের সামনে সেই পূর্বের লাল শাদা খুঁটির প্রতীক আছে। অনেকে আবার লাল এবং শাদা কাপড়ও ব্যবহার করেন।

ভারতবর্ষেও এককালে নাপিতেরাই অস্ত্রোপচার চালাতেন। চিকিৎসকরা পরের দিকে রোগীর রক্ত পুঁজ ঘাঁটতে দ্বিধা বোধ করায় সেই কাজটি নাপিতেরাই গ্রহণ করেছিলেন। এখনও অনেক নাপিত পায়ের পাতা থেকে কাঁটা বার করানো, ফোঁড়া চেরা ইত্যাদি ব্যাপারে দক্ষ। তবে অস্ত্রকে জীবাণুমুক্ত করার প্রয়োজন অনুভব করেন না। ফলে হিতে বিপরীত হয়।

সঙ্গীতে ব্যবহারযোগ্য বাদ্যযন্ত্র

মানুষ চিরকালই কিছুটা ভাবুক ছিল এবং এইখানেই ছিল ইতর জন্তুজানোয়ারদের সঙ্গে তার তফাত। মানুষের জীবনে নিরাপত্তা এলে তাদের ভাবপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়। নদীর কুলুকুলু ধ্বনি, ঝরণার ঝরঝর, বাতাসের মধুর মর্মরধ্বনি মনকে নাড়া দিতো। হয়ত দাঁড়িয়ে উপভোগও করতো সেইসব সাঙ্গীতিক সুর। অনেকের মতে মানুষ কথা বলার আগে সংগীতকে রপ্ত করেছিল। প্রাকৃতিক বেশ কিছুকিছু শব্দ প্রত্যেক ভাষাভাষির শব্দ ভাণ্ডারে স্থান পেয়েছে।



বাদ্যযন্ত্র না হলে সঙ্গীত জমে না। শ্রুতিমধুরও হয় না। কিন্তু বাদ্যযন্ত্র যে কবে তৈরি করেছিল তা সঠিকভাবে বলার কোন উপায় নেই। একেবারে আদিমযুগের আবিষ্কার বলা যেতে পারে। গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে প্যান নামে এক তরুণ প্রথম বাঁশি তৈরি করেছিলেন। তিনি একটি নদীর তীরে বসেছিলেন। নদীর তীরে অদূরে ছিল মোটা মোটা নলখাগড়ার বন। নদীর কুলুকুলু ধ্বনি তাঁকে যেন বিবশ করে ফেলেছিল। সেখানকার অপূর্ব সৌন্দর্য দেখে একটি দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করেছিলেন তিনি। সেই দীর্ঘশ্বাস নলখাগড়ার বনে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে

আসে গভীর শোকাবহ এক বিলাপ বা মূর্চ্ছনার মত। তিনি অবাক হন। এবং উঠে গিয়ে অসমমাপের কয়েকটা নলখাগড়াকে কেটে আনেন। তারপর বাঁশিরূপে ব্যবহার করেন। সেই থেকে নাকি বাঁশির উদ্ভব। নলখাগড়ার বাঁশি, বাশের বাঁশি ইত্যাদি।

ড্রাম জাতীয় বাদ্যযন্ত্র কিন্তু বহু প্রাচীন। আদিম মানবগোষ্ঠী কাঠের গুঁড়ির ভেতরটাকে পুড়িয়ে অনেকটা ঢোলকের মত জিনিস তৈরি করেছিল। একমুখ মাত্র খোলা রাখতো এবং খোলামুখে টানটান করে বেঁধে দিতো পশুর চামড়াকে পরিষ্কার করে। আদিম এই ড্রাম দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল এবং এখনও কোন কোন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ ব্যবহার করে থাকেন। প্রাচীনকালে রাজরাজড়াদের অট্টালিকার সামনেও রাখা হতো অনুরূপ বৃহদাকার ড্রাম। ড্রামে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করলে জোর শব্দ উঠতো। বিপদসঙ্কেত জানিয়ে দেওয়ার প্রধান মাধ্যম ছিল এটি। শব্দ শুনে ছুটে আসতো সৈন্যসামন্ত, লাঠিয়াল প্রভৃতি। ঐ জাতীয় ড্রাম আদিবাসীরা নাচের সময়ও বাজাতো এবং এখনও বাজায়।

ড্রামের উৎপত্তির পর দীর্ঘকাল নাচের সময়ই ড্রাম ব্যবহার করা হতো আর হাততালি দিতো। নাচের সঙ্গে গানও ধরতো। আনন্দপ্রকাশের একমাত্র মাধ্যম ছিল ঐ নাচ ও গান। সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে এখনও অল্পস্বল্প বেঁচে আছে। অনেকের মতে সেদিনের মানুষের গান জীবনযাত্রার একটা অঙ্গ ছিল।

মানুষ একমাত্র ড্রাম নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। অন্যান্য উপকরণও খুঁজেছিল। ড্রামের পরেই আবিষ্কার করেছিল বাঁশি। প্রথম প্রথম বাঁশির সুর বাঁধা ছিল না। নলখাগড়া, পশুর শিং ইত্যাদিতে ফুঁ দিয়ে শব্দ সৃষ্টি করতো। পরে নানা শিল্পীর প্রচেষ্টায় ও চিন্তা-ভাবনার ফলে প্রকৃত বাঁশি আত্মপ্রকাশ করেছিল। আদিম বাঁশি বলতে ফুঁ দিয়ে বায়ু পাঠানো নল। শিঙার মত। ইংরেজিতে উইন্ড পাইপ যাকে বলে। ব্রোঞ্জযুগে ঐ উইণ্ড পাইপ পশুর শিঙের পরিবর্তে ব্রোঞ্জ দিয়ে নির্মাণ করা হতো।

অনেক পরেই তারযন্ত্র আবিষ্কার করেছে। পুরাকালেই উদ্ভব হয়েছিল। ভারতের পৌরাণিক কাহিনীতে দেখা যায় দেবর্ষি নারদ বীণা বাজিয়ে গান করতেন। শিব ডমরু বাজাতেন। সরস্বতীর হাতেও বীণা। সেকালে সাধারণ বেহালা জাতীয় তারযন্ত্রও সম্ভবত আবিষ্কৃত হয়েছিল। তবে তারযন্ত্র প্রাচ্যেরই আবিষ্কার বলে মনে করেন অনেকে। ধর্মযুদ্ধ ক্রুসেডের সময় পাশ্চাত্যের মানুষ প্রাচ্যের সংস্পর্শে আসেন এবং তারযন্ত্র সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হন। পরের দিকে তারযন্ত্র-সহ অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের উন্নতি হয় এবং নতুন নতুন বাদ্যযন্ত্রেরও উদ্ভব হয়।

নাচের উদ্ভব

নাচেরও উদ্ভব হয়েছিল সেই কোন আদিকালে—মানুষের গুহাবাসের কালে। শিকার করতে যাওয়ার আগে তারা শিকারের মহড়া দিতো। দু-চারজন হরিণ সাজতো, বাকিরা শিকারী। বেশ কিছুক্ষণ চলতো এই মহড়া। ধারণা ছিল, শিকারে বেরুবার আগে শিকারের মহড়া দিলে ভাল শিকার জোটে। শিকারের মহড়া ছিল এক ধরনের নাচ। পোশাক বলতে কিছু ছিল না বটে, তবে হরিণের মুখোস পরতো কিংবা মাথায় বেঁধে ফেলতো হরিণের শিং। সারা অঙ্গ লাল মাটি, খড়ি মাটি ইত্যাদি দিয়ে চিত্র-বিচিত্রও করতো।

সন্ধ্যার আগে শিকার থেকে ফিরে এলেও অনেক সময় আনন্দে নাচতো। শিকার বেশি জুটলে তো কথাই নেই। গুহার সামনে জড় হতো স্ত্রীপুরুষ ছেলেমেয়ে সবাই। অগ্নিকুণ্ডে শিকারকে পোড়াতো এবং অগ্নিকুণ্ডকে ঘিরে স্ত্রীপুরুষ সবাই নাচতো। সে নাচের হয়ত কোন ছন্দ ছিল না। তালমানও বজায় থাকতো না। একমাত্র আনন্দের অভিব্যক্তিই ছিল সেই নাচ। নাচের সঙ্গে গানও ধরতো না। কেননা তখনও ভালভাবে কথা বলতে শেখেনি মানুষ। শুধু কতকগুলো সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করতো। পাখিদের মত কিচিরমিচির করতো। নাচের মাধ্যমে আনন্দের অভিব্যক্তি শুধু মানুষের নয়, পশুপাখিদেরও। তাই নাচটা যেন প্রকৃতিপ্রদত্ত।

আদিকালের সেই নৃত্য ছিল উদ্দাম। প্রকৃত সামাজিক নৃত্য বলা যাবে না। এক একটা গুহায় শতাধিক স্ত্রীপুরুষ, বৃদ্ধবৃদ্ধা ও ছেলেমেয়েরা বাস করতো। সন্ধ্যার আগে তাদের সবাই মিলে হয়ত আনন্দে নাচতো এবং করতালি দিতো। সামাজিক নৃত্য এবং বাজনার তালে তালে নাচ অনেক পরের ঘটনা। হয়ত সেই নগর সভ্যতার সময় এর সূচনা হয়েছিল। আনন্দদানের বিশুদ্ধ উপকরণ হিসেবে সমাদৃত হয় গ্রীকদের আমলে। কথিত আছে গ্রীকরা নাচ খুব ভালবাসতেন। এমনকি অ্যারিস্তোতলের মত মহান পণ্ডিত ব্যক্তিও। তিনি মনে করতেন, নাচের মাধ্যমে মানুষের সুকুমার বৃত্তির প্রকাশ ঘটে এবং মানুষের কর্মশক্তি বাড়ায়। এই ধরনের নাচকে মহাকবি হোমারও ভারি পছন্দ করতেন।

রোমান আমলেও নাচ বেশ জনাপ্রিয় ছিল। তৎকালীন রোমান বাগ্মী সিসেরো বলতেন. সংযমপূর্ণ নাচ মানুষের মানসিক উন্নতি ঘটায় এবং সমাজের পক্ষে অত্যন্ত শোভন ও সুন্দর। পানোৎসবে ও আমোদপ্রমোদের নাচকে তিনি উচ্ছৃঙ্খলতা মনে করতেন। অনৈতিক বলেও মনে করতেন তিনি।

অবশ্য পানোৎসবে কিংবা ভোজোৎসবে নৃত্যপ্রদর্শন অতি প্রাচীনকালেই উদ্ভব হয়েছিল। খ্রীস্টজন্মের তিন হাজার বছর আগে মিশরেই সূচনা হয়েছিল। সাধারণত

নৈশভোজে অতিথিদের আপ্যায়িত করতে নাচের ব্যবস্থা করা হতো। গ্রীকদের আমলেও প্রচলিত ছিল এবং যেকোন পর্বদিনে ভোজ্যোৎসবে নৃত্যগীতের আয়োজন করা হতো। সক্রেটিস, প্লেটোর মত মহাজ্ঞানীরাও ঐ নাচকে সমর্থন করতেন।

ভারতে উন্নত মানের নাচের প্রচলন হয়েছিল অনেক আগে। ঐ নাচের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মাচরণ। বৈদিক যুগেই দেবতার মন্দিরে দেবতাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য দেবদাসী নিযুক্ত করা হতো। দেবদাসীরা নিয়মিত মন্দিরের বিগ্রহের সম্মুখে নৃত্য পরিবেশন করতেন। এমনও মনে করা হয়, এই প্রথা প্রথম মিশরেই চালু হয়েছিল। পরে ভারত প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। গ্রীক আমলেও মন্দিরে দেবদাসী নিযুক্ত করার প্রথা বিদ্যমান ছিল বলেও অনেকের ধারণা। এমনকি ভারতের সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে এমন কিছু কিছু নমুনা পাওয়া গেছে—যা প্রমাণ করে দেবদাসী প্রথা সিন্ধু সভ্যতার সময়ও ভারতে ছিল। প্রাচীন মন্দিরগাত্রেও খোদিত আছে নৃত্যরতার মূর্তি।

ভারতীয় নৃত্যের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য ছিল। অতি উচ্চাঙ্গ নৃত্য। নানা অঞ্চলে নানা সংস্কৃতি ও ধর্মীর প্রভাবে নৃত্যগুলির উদ্ভব হয়েছিল। কত্থক, ভারতনাট্যম, কথাকলি, মণিপুরী ইত্যাদি অন্যতম। ঐ সব নৃত্যের মাধ্যমে ভারতীয় দর্শন, ধর্মীয় ভাবনা ইত্যাদিকে আন্তরিকভাবে প্রকাশ করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। অপরাপর দেশের মত কেবলমাত্র আনন্দদান ভারতীয় নৃত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। এই ধারা এখনও চলে আসছে। মধ্যযুগ থেকে পাশ্চাত্যে নানা ধরনের নাচের উদ্ভব হয়েছিল। সেইসব নাচের সঙ্গে কোন ধর্মীয় ভাবনাকে যুক্ত করা হয়নি। শুধু আনন্দলাভ ও আনন্দদানই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। বিলাসোপকরণও বলা যেতে পারে। বল নাচ, ওয়ালজ, ফক্সট্রপ, ওয়ান স্টেপ ইত্যাদি বেশ প্রচলিত। বল নাচ প্রাচীন ইংলণ্ডের গ্রাম্য নাচ মরিস নৃত্যই উৎস। বিদেশে গ্রাম্য নৃত্য হিসেবে স্কোয়ার ড্যান্সের বেশ প্রচলন আছে। তাছাড়া রীল, মজুরকা, গ্যাভট প্রভৃতি নাচেরও এককালে খুব সুখ্যাতি ছিল। বর্তমানে ইওরোপের জনপ্রিয় নাচ ব্যালে ও ক্যাবারে।

খাল খনন

নদী প্রকৃতির সৃষ্টি। পাহাড়ের বৃষ্টির জল এবং বরফগলা জলকে নদী ঘুরপথে পৌঁছে দেয় সাগরে। অধিকাংশ নদী বছরের প্রায় সবসময় জলে পুষ্ট থাকে। সেই জলকে সেচের কাজে ব্যবহার বেশ প্রাচীন। এই কারণে মানুষ প্রথম নদীর তীরভূমিতে বসতিস্থাপন করেছিল এবং পরে গড়ে উঠেছিল নগর সভ্যতা। সেদিনের নগর সভ্যতা প্রকৃতপক্ষে কৃষিভিত্তিক সভ্যতাই ছিল। নীল, ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস, সিন্ধু

প্রভৃতি নদীর তীরে গঠিত হয়েছিল কৃষিভিত্তিক সভ্যতা। অবশ্য কেবলমাত্র কৃষিকাজের জন্য নয়, অন্যান্য অনেক কারণে মানুষের জল নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর অন্যতম। জলের অপর নাম তাই জীবন। পানীয় জল, সেচের জল, রান্নার জল, স্নানের জল ইত্যাদির জন্য তারা সেদিন নদীর তীরকেই পছন্দ করতো।

পরের দিকে নদীমাতৃক সভ্যতার প্রসার ঘটলে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে মানুষ নদীর তীর থেকে অনেক দূরে দূরেও বসতি স্থাপন করতে সচেষ্ট হয়। তখনই জলের অভাব পূরণ করতে তাদের নদী থেকে খাল কাটতে বাধ্য হতে হয়েছিল। খাল কাটার কাজ সম্ভবতঃ প্রথম মিশরই শুরু করেছিল। অধিকাংশ স্থান ছিল মরুপ্রায়। বৃষ্টিপাত ভালভাবে হতো না। তাই বুদ্ধি করে তারা খাল কেটেছিল। খাল কেটেছিলেন সেকালের মিশরের ফ্যারাও বা রাজারা। প্রজাদের জলাভাব দূর করতে এবং ফসল ফলাতে এই ব্যবস্থাই করেছিলেন মিশরের বেশ কয়েকটি রাজবংশ। হয়ত এই কারণে সেদিনের মিশরীয় সভ্যতার সুনাম অপর সমূহ সভ্যতাকে ছাপিয়ে উঠেছিল। দেশে অন্নাভাব ছিল না।

ফ্যারাওরা বহু ছোট ছোট খাল খনন করেছিলেন। অনেকের মতে খাল খননের চিন্তা প্রথম মিশরীয়দের মাথায় এসেছিল। তবে বড় খালও খনন করা হয়েছিল। সবচেয়ে বড় খাল ছিল নীলনদ থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। একদিকে জলসেচের যেমন সুবিধা হতো তেমনই নৌকার সাহায্যে যাত্রী ও মাল পরিবহনেরও সুবিধা হতো। হঁ্যা, জলপথে দূরে যাতায়াত করার জন্যও খালের পরিকল্পনা হয়েছিল। স্থলযান সেকালে ছিল না। স্থলপথে পণ্য পরিবহনের জন্য একমাত্র মানুষ ও পশুশক্তিই ভরসা ছিল। তারা আর কতটুকুই বা পরিবহন করতে পারে। অথচ প্যাপিরাসের নৌকা বহু মানুষ এবং প্রচুর পণ্যকে একসঙ্গে পরিবহন করতে পারতো।

মিশরের পরে প্রাচীন চীনদেশও খাল খননের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। তাদেরও খাল খননের উদ্দেশ্য ছিল পরিবহনের উন্নতি ও জলকষ্ট দূরীকরণ। বড় খাল থেকে ছোট ছোট খাল কেটে কৃষিক্ষেত্রেও জল সরবরাহ কবতো। চীনদেশের প্রথম বড় খাল কাটা হয়েছিল খ্রীস্টজন্মের প্রায় ৫০০ বছর আগে। ১৪০০ কিলোমিটার এই লম্বা খালটি হ্যাংচা থেকে পিকিং পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খালটি এখনও আছে এবং এই খালটি পৃথিবীর বৃহত্তম খাল।

পরের দিকে খাল কাটার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নানা দেশ। পৃথিবীর জনসংখ্যাও ততদিনে বেড়ে উঠেছে অনেকখানি। নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে মানুষ। রাজ্য ও রাজধানীও স্থাপিত হয়েছে অনেক। তাই জল সরবরাহের জন্য বা সুষ্ঠুভাবে বৃষ্টির জলকে নিকাশের জন্য প্রত্যেকটি দেশকে একরকম খাল খনন করতে বাধ্য হতে হয়েছিল। সেসময় উল্লেখযোগ্য যে খালটি খনন করা হয়েছিল

"বালটিক হোয়াইট সী" খাল। রাশিয়ায় খনন করা হয়েছিল এবং খালটির দৈর্ঘ্য ২১০ কিলোমিটার।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে কাটা দুটি গুরুত্বপূর্ণ খালের একটির নাম সুয়েজ খাল এবং অপরটি পানামা খাল। এই দুটি খালের ভৌগোলিক গুরুত্ব অপরিসীম।

সুয়েজ খাল কাটা হয়েছিল ভারতের সঙ্গে পাশ্চাত্যের সরাসরিভাবে যোগাযোগের জন্য। বিদেশী বণিকদের ভূমধ্যসাগর থেকে আফ্রিকার পূর্ব উপকূল ঘুরে অনেক ঘুরপথে ভারতে আসতে হতো। স্থলপথ আদৌ নিরাপদ না হওয়ার জন্য প্রাচ্যের অন্যান্য দেশেও তাদের আসতে হতো ঐ ঘুরপথে। সময় লাগতো অনেক দিন। তাই ভূমধ্যসাগর থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত একটি জলপথ তৈরির চিন্তা মাথায় আসে পাশ্চাত্যের। দূরত্ব মাত্র ১৬৫ কিলোমিটার। ঐ পথকে খালের মাধ্যমে যুক্ত করলে শত শত মাইল ঘুরতে হবে না। খালটির পরিকল্পনা করেছিলেন ফার্দিনান্দ দ্য লেসেপস নামে এক ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর পরিকল্পনা মত খাল কাটা শেষ হয়েছিল ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে।

এই রকমই একটি গুরুত্বপূর্ণ পানামা খাল। মধ্য আমেরিকার পানামা শহর থেকে অপর পাশে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত কোলন শহরে যেতে হলে জলপথে আটলান্টিক সাগর থেকে উপকূলভাগ ধরে ধরে প্রশান্ত মহাসাগরে পড়তে হতো। তারপরেও দীর্ঘপথ অতিক্রম করার পর পৌঁছাতে হতো কোলন শহরে। কিন্তু স্থলপথে এই দুই উল্লেখযোগ্য শহরের দূরত্ব ছিল মাত্র ৬৫ কিলোমিটার। ঐ পথটুকু সহজে এবং অল্পসময়ে অতিক্রম করার জন্য খাল খননের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন গয়ট্ হালস্। খাল খনন সম্পন্ন হয় ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে। ঐ বছরের ৩রা আগস্ট থেকে শুরু হয় জাহাজ চলাচল।

কারাগার ও অপরাধীর শাস্তিবিধান

মানুষ যেদিন সমাজ গঠন করেছিল সেইদিনই কিছু কিছু নিয়ম রচনা করেছিল। সে িয়ম সুস্থ ও সুন্দর সমাজজীবনের জন্য। কিন্তু সমাজে সব সময়ই কিছু না কিছু অপরাধপ্রবণ মানুষের আবির্ভাব হতো। এবং আজও সমাজে অপরাধপ্রবণ মানুষের সংখ্যা কিছু কম নয়। সামাজিক নিয়ম ভঙ্গকারীদের তাই প্রথম থেকেই শাস্তিদানের ব্যবস্থা হতো। অপরপক্ষে মানুষের মধ্যে যখন যুদ্ধোন্মাদ বেড়ে উঠে তখন যুদ্ধে পরাজিতদের কঠোর শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা হয়েছিল। সে শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ছাড়া কিছুই ছিল না। কারাগারের পরিকল্পনা অনেক পরের ঘটনা।

অপরাধীকে শাস্তিদানের ব্যাপারে প্রাচীনকালেই প্রচলিত হয়েছিল মৃত্যুদণ্ড। তবে

মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে এক সুরক্ষিত জায়গায় রাখা হতো। সে যাতে পালিয়ে যেতে না পারে এবং তার জন্য প্রহরীরও ব্যবস্থা করা হতো। আদিকালের কারাগার বলতে এমনই একটি সুরক্ষিত স্থানের ব্যবস্থা এবং তাতে দু-একজন ছাড়া বেশি লোককে আটক করা হতো না।

গ্রীক আমলে সমাজের প্রচলিত নিয়মকে যাঁরা ভঙ্গ করতেন তাঁদের বিষ খাইয়ে হত্যা করা হতো। তার প্রমাণ মহাত্মা সক্রেটিস (খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী)। তাঁকে হেমলক বিষ পান করানো হয়েছিল। হেমলক এক ধরনের বিষাক্ত গাছ।

ভারতেও সেসময় অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার নানা পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছিল। অতি নিষ্ঠুর সেসব পদ্ধতি। অবশ্য এমন নিষ্ঠুরতা অপরাপর দেশের রাজারাও অবলম্বন করতেন। জীবন্ত অবস্থায় মাটির তলায় কাঁটার ঝোপের উপর ফেলে দিয়ে মাটি চাপা দেওয়া, গলা পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে দিয়ে শেয়াল কুকুরকে লেলিয়ে দেওয়া, দেহের চামড়াকে অগ্নিদগ্ধ সাঁড়াশি দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে বার করে আনা, মাথার চুল ও চামড়াকে চেঁচে দিয়ে তার উপর যন্ত্রণাদায়ক কোনকিছু ঢেলে দেওয়া, তরবারির আঘাতে শিরচ্ছেদ করা, শূলে দেওয়া ইত্যাদি। যাদের অপরাধ খুব বেশি বলে বিবেচিত হতো না, তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হতো। কিংবা মাথা ন্যাড়া করে ঘোল ঢেলে গাধার পিঠে চড়িয়ে ঘোরানো হতো।

ভাবতে এই ধরনের জঘন্য ও নিষ্ঠুরতম শাস্তির ব্যবস্থা দীর্ঘকাল চলে এসেছিল। এমনকি মুঘলযুগেও বিদ্যমান ছিল। কথায় কথায় মুণ্ডচ্ছেদ। যুদ্ধে পরাজিত রাজাকেও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হতো। কেবল রাজা নয়, রাজার উত্তরাধিকারীদেরও হত্যা করা হতো।

সেকালে অন্যান্য দেশের শাস্তির ব্যবস্থাও ছিল নিষ্ঠুর ও অতি জঘন্যতম পদ্ধতি। রোমান আমলে অপরাধীদের অভুক্ত বাঘ সিংহের খাঁচার মধ্যে পুরে দেওয়া হতো। যীশুখ্রীস্টকে হত্যা করা হয়েছিল ক্রুশে বিদ্ধ করে। জীবন্ত অবস্থায় আগুনে পুড়িয়ে মারার প্রথাও সেকালে প্রচলিত ছিল। সাধারণত ডাইনী বলে যেসব মেয়েকে সন্দেহ করা হতো তাদেরই জীবন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে মারা হতো। রোমানযুগে প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ পণ্ডিত থিওনের কন্যা হাইপেসিয়াকে ডাইনী ভেবে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। পুড়িয়ে মারা হয়েছিল বীরাঙ্গনা জোয়ান অব আর্ককে। এমনকি আধুনিককালেও এমন ঘটনা ঘটেছে। প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধাচারণ করায় ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। এও সত্য ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্তও পাশ্চাত্য ডাইনীতে বিশ্বাস করতো। আজকের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের মত।

যাইহোক অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরাধীর শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড এবং এক নারকীয় পদ্ধতিতে হত্যা করা হতো। পাশ্চাত্যে ঐ হত্যার জন্য নানারকম যন্ত্রেরও উদ্ভাবন

হয়েছিল। তাদের মধ্যে ইংলন্ডের স্টকস, পিলরী ও ফ্রান্সের গিলোটিন অন্যতম। ফরাসী বিপ্লবের সময় গিলোটিনে চেপে হত্যা করা হয়েছিল অজস্র মানুষকে। ইগনেস গিলোটিন নামে এক ফরাসি ডাক্তার যন্ত্রটি উদ্ভাবন করেছিলেন বলে অনুরূপ নাম। এসব যন্ত্র পরিত্যক্ত হলেও গণহত্যার জন্য সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীরা নানা ধরনের মারণ যন্ত্রের ব্যবস্থা নিজেরাই উদ্ভাবন করতেন। হিটলার ইহুদীদের হত্যার জন্য গ্যাস চেম্বার ব্যবহার করেছিলেন। একসঙ্গে বহু ব্যক্তিকে একটি ছোট ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে নাইট্রোজেন গ্যাস ঢুকিয়ে দেওয়া হতো। পরে মৃত্যুদণ্ডের জন্য ফাঁসির ব্যবস্থা চালু হয় এবং জঘন্যতম অপরাধের শাস্তি হিসেবে ফাঁসি এখনও প্রচলিত।

শাস্তির আর একটি ব্যবস্থা কারাগারে আটকে রাখা। কারাগারের ব্যবস্থা বেশি পুরনো নয়। পাশ্চাত্যে যে সময় কয়েদের ব্যবস্থা হয় তখন কয়েদীদের দিয়ে নানা ধরনের শ্রমবহুল কাজ করিয়ে নেওয়া হতো। দূর সমুদ্রগর্ভে কোন নির্জন দ্বীপেও ছেড়ে দিয়ে আসা হতো। কথিত আছে, অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল নির্বাসিত ইংরাজ অপরাধীরা। নির্বাসন দণ্ড ভারতে বহু পূর্বেই উদ্ভুত হয়েছিল। কালিদাসের লেখা মেঘদূত তার প্রমাণ।

অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড ব্যতীত অন্যান্য শাস্তিরও উদ্ভব হয়েছিল। তাদের মধ্যে কয়েদখানা অন্যতম। মূল উদ্দেশ্য ছিল শাস্তিদানের মাধ্যমে অপরাধীর অপরাধ প্রবণতা দূর করা এবং সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। প্রথম প্রথম অপরাধীকে কয়েদে আটকে রাখা হতো এবং মুক্তিপণ আদায় করে ছেড়ে দেওয়া হতো। একরকম ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে কারাবাসের নিয়মকানুন প্রবর্তন করে পাশ্চাত্য। তবে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে কারাগার বহু আগেই গড়ে উঠেছিল। এক কথায় তৎকালীন কারাগারগুলো ছিল কয়েদীকে তিলে তিলে দগ্ধ করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ যে একবার কারাগারে ঢুকতো, সে জীবন্ত অবস্থায় বাহিরে আসতে পারতো না।

অপরাধীর চরিত্র সংশোধনের উদ্দেশ্যে ইওরোপের কয়েকটা দেশ ১৫৫০ খ্রীস্টাব্দের দিকে স্থাপন করে "ওয়ার্ক হাউস" বা "হাউস অব্ কারেকশন'। প্রথম প্রথম ওতে স্থান লাভ করতো ভিক্ষুক, নিষ্কর্মা বা ভবঘুরে, পলাতক ব্যক্তি, দেনাদার প্রভৃতিরা। পরের দিকে ঐ "ওয়ার্ক হাউসই" অপরাধীদের জন্য নির্দিষ্ট হয় এবং অপরাধী যাতে পালিয়ে যেতে না পারে তার জন্য সুরক্ষিত কক্ষও তৈরি হয়। প্রথম প্রথম কয়েদীদের থাকা খাওয়ার ব্যাপারে আদৌ যত্ন নেওয়া হতো না, কঠোর শ্রমও করতে হতো। অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে কারাগারের পরিবেশের কিছুটা উন্নতিসাধন করা হয়। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে আরও উন্নতি হয়েছে কারাগৃহের। কয়েদীদেরও কিছুটা সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা হয়েছে।

মৃতদেহ সংরক্ষণ

মৃতদেহ সংরক্ষণ করা খুবই অসুবিধাজনক। মানুষের মৃতদেহকে দীর্ঘকাল ধরে বর্তমানেও সংরক্ষণ করা হয় না। মহান ব্যক্তিরা মারা গেলে মাত্র কয়েকদিন পর্যন্ত বরফের মধ্যে রাখা হয়—যাতে দেহে পচনক্রিয়া শুরু না হয়। মৃতদেহের সংরক্ষণের ব্যাপারে বরফের একটা মস্তবড় ভূমিকা আছে। বরফের মধ্যে চাপা থাকলে দেহ হাজার হাজার বছর একেবারে অবিকৃত অবস্থায় থাকতে পারে। তার প্রমাণও পাওয়া গেছে। সাইবেরিয়া অঞ্চলে—যেখানে বরফের স্তূপ জমাট বেঁধে আছে, সেখানে বরফ গললে মাঝেমাঝে দু-একটা পশু বেরিয়ে পড়ে। হাজার হাজার বছর আগে অবলুপ্ত দু-একটা ম্যামথকেও আবিষ্কার করা হয়েছে। তাদের দেহে আদৌ পচন ধরেনি। মাংসাশী জন্তুরা এমন একটি মৃতদেহকে লাভ করলে পরমানন্দে ভোজন করে। তাই প্রকৃতির বড় সংরক্ষক বরফ।

ল্যাবোরেটারিতে কোন প্রাণীদেহকে সংরক্ষণ করতে হলে ফরম্যালডিহাইড দ্রবণে ডুবিয়ে রাখতে হয়। মাঝে মাঝে দ্রবণটাকে পরিবর্তনও করতে হয়। যাদুঘরে যেসব পশুপাখির মৃতদেহকে সংরক্ষণ করা হয় তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। নাড়িভুঁড়িকে বাদ দিয়ে দেহের চামড়াকে ভালভাবে শুকিয়ে এবং কিছু কিছু রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। তাও দীর্ঘকাল একইভাবে থাকে না। কিছুকাল পরে নষ্ট হয়ে যায়।



আশ্চর্য, প্রাচীন মিশরে উদ্ভূত মৃত মানুষের দেহের সংরক্ষণ। সভ্যতার একেবারে উষালগ্নে তারা তাদের রাজাদের মৃতদেহকে এমনভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল যে, আজও সেগুলো টিকে আছে। মিশরীয়দের দ্বারা সংরক্ষিত মৃতদেহকে মামী বলে।

মামী কিন্তু আরবী শব্দ। অর্থ মোম ও আলকাতরা (Tar) দিয়ে সংরক্ষিত দেহ। খ্রীস্টজন্মের ৩০০০ বছর আগে তারা মৃতদেহকে মামীর রূপ দিতো। তারপর তাকে সমাহিত করতো পিরামিডের তলায় কবরখানায়। তেমন একটি মামী কলিকাতায় যাদুঘরে রয়েছে।

এখন প্রশ্ন, কীভাবে মিশরীয়রা মৃতদেহকে মামীতে পরিণত করতো? যা কয়েক হাজার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও অবিকৃত আছে! কেনই বা তারা মামী তৈরি করতো?

মামী তৈরি করা প্রচণ্ড খরচবহুল ব্যাপার ছিল। তার উপর একটি মামী তৈরি করতে কম করে ৭০ দিন সময় লাগতো। তাই একমাত্র রাজা (মিশরীয় কথায় ফ্যারাও) ছাড়া আর কারও মৃতদেহকে মামীতে পরিণত করা হতো না। পরের দিকে এ-ব্যবস্থা লুপ্ত হয়ে গেছে।

সেকালে মিশরীয়দের বিশ্বাস ছিল, মৃত্যুর পরও একটা জীবন থাকে। তার আত্মা দেহছাড়া হয়ে দিনের বেলায় পাখি হয়ে ঘুরে বেড়ায়। রাত্রিবেলায় অশুভ শক্তির বিকাশ ঘটে এবং আত্মা তখন ফিরে এসে কবরের তলায় দেহকে আশ্রয় করে। তাই শুধু মৃতদেহকে মামীতে পরিণত করে কবর দেওয়া হতো না, জীবদ্দশায় তিনি যেসব জিনিস ব্যবহার করতেন তার সবকিছুই কবরে স্থানলাভ করতো। প্রচুর অর্থ এবং মূল্যবান অলঙ্কারও। দস্যুরা যাতে মূল্যবান সামগ্রীগুলোকে লুটে নিয়ে যেতে না পারে তার জন্য উপরে পিরামিড এবং পিরামিডের তলায় অজস্র গোলকধাঁধার মত পথ ছিল।

পণ্ডিতদের অনুমান, মৃতদেহকে মামীতে পরিণত করতে গিয়ে বিশেষজ্ঞরা প্রথমে শবদেহকে ব্যবচ্ছেদ করে ভেতরের যন্ত্রপাতিগুলোকে বার করে আনতো। মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, বৃহদন্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র প্রভৃতি সব কিছুই। তারপর ঐগুলোকে একটা পাত্রে সংরক্ষণ করতো এবং ভালভাবে শুকিয়ে নিতো। অতঃপর মৃতদেহকে গাঢ় লবণজলে ভিজিয়ে রাখতো কয়েকটা দিন। তারপর মরুর শুষ্ক বাতাসে ভালভাবে শুকিয়ে নিতো।

মামী করার উপযুক্ত হলে পেটের ভেতরে পিচ ঢুকিয়ে সেলাই করে দিতো। সংরক্ষণ করা হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্ককেও যথাস্থানে রেখে দিতো। অবশেষে দেহকে ভালভাবে পরিষ্কার করে রেজিনের প্রলেপ দিতো। মামীর সারা অঙ্গ ঢেকে দিতো মূল্যবান কাপড়ের ফালি জড়িয়ে।

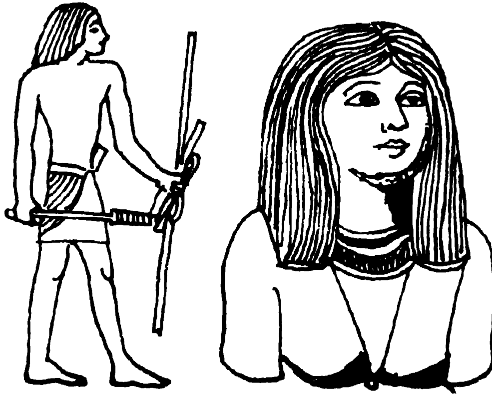
এদিকে ছুতাররা তৈরি করতো একটি সুদৃশ্য কাঠের বাক্স। বাক্সের গায়ে নকশাও করা হতো। কবরখানাটাকেও সাজানো হতো অতি সুন্দরভাবে। চিত্রে চিত্রে ভরিয়ে দিতো দেওয়ালগুলো। লিখে দিতো যে রাজার দেহকে কবর দিচ্ছে তার পরিচয়। যে রঙ দিয়ে ছবি আঁকতো সে রঙের ঔজ্জ্বল্য এখনও নষ্ট হয়নি। কবরখানা থেকে

প্রাপ্ত নমুনাগুলো থেকে সেদিনের মিশরের ইতিহাসকে জানা গেছে এবং জানা গেছে তাদের মূল্যবান আবিষ্কারগুলো। তৎকালীন সামাজিক জীবনেরও পরিচয় পাওয়া যায় তাদের আঁকা চিত্র ও দেওয়াল লিখন থেকে। দুঃখের বিষয়, এত সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও পরবর্তীকালে আবির্ভূত কবরদস্যুদের কবল থেকে দু-একটি ছাড়া কোন কবর রক্ষা পায়নি।

পরচুলা

মধ্যযুগের ইওরোপের বড় বড় কবি, দার্শনিক, বিজ্ঞানী থেকে রাজা রানীর ছবি দেখলে মনে হয় তখনকার দিনে বড় চুল রাখাটাই যেন প্রচলিত রীতি ছিল। কিন্তু এত বড় বড় ঢেউ খেলানো চুল!

হাঁ, চুল রাখার যেমন রীতি ছিল তেমনই যাঁদের মাথায় জুৎসই চুল থাকতো না তাঁরা পরচুলা ব্যবহার করতেন।



পরচুলা ব্যবহার অতি প্রাচীন। মিশরীয়রা মামীর মাথায় পরচুলা বসিয়ে দিতেন। কেবল তাই নয়, অনেকেই পরচুলা জীবদ্দশায় ব্যবহার করতেন। অতীতের মিশরীয় ছবিগুলো দেখে এমনই অনুমান করা হয়।

গ্রীকরাও পরচুলা ব্যবহার করতেন। পুরুষ এবং স্ত্রীলোক উভয়েই। গ্রীকরা নাটক অভিনয় করতেন। পুরুষেরা মেয়ে সাজতেন। ব্যবহার করতেন একঢাল কালো চুল। গ্রীকদের কাছ থেকে পারস্যে এবং পারস্য থেকে পরচুলা ব্যবহার ছড়িয়েছিল এশিয়া মাইনরে।

রোম সাম্রাজ্যের গোড়া থেকেই পরচুলা ব্যবহার চলে এসেছিল। বিশেষ করে অভিজাত কেতাদুরস্ত মহিলারা। ঢেউ খেলানো লম্বা চুলের পরচুলা তাঁদের খুব

প্রিয় ছিল। সে পরচুলা আবার শুধু কালো রঙের হতো না। সুন্দর সোনালী রঙেরও হতো। সোনালী পরচুলা জার্মানদের নাকি ভারি পছন্দ ছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে ইওরোপে পরচুলার উন্নতি ঘটে। সাধারণ পরচুলা এবং বিশেষ পরচুলা। বিশেষ পরচুলাকে এমনভাবে তৈরি করা হতো যে সাধারণ চুলের মতই দেখাতো। ১৬২৪ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সের রাজা ত্রয়োদশ লুই পরচুলা ভারি পছন্দ করতেন। তাঁর মাথাভর্তি টাক ছিল। তাই সবসময় পরচুলা দিয়ে টাক ঢেকে রাখতেন। সাধারণ মানুষকেও পরচুলা ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

সেসময় ইওরোপের অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল পরচুলার ব্যবহার। ইংলন্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস ছোট চুলবিশিষ্ট পরচুলা পরতে শুরু করেন এবং ঐ পরচুলাই ইংলন্ডে জনপ্রিয় হয়ে উঠে। ঐ সময় রানী অ্যানি ব্যবহার করতেন ঘন ও লম্বা চুলওয়ালা পরচুলা। পরচুলার ঢেউ খেলানো চুল সারা পিঠটাকে ঢেকে রাখতো এবং লম্বায় বুক পর্যন্ত ছিল।

পরবর্তীকালে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা বিভিন্ন ধরনের পরচুলা ব্যবহার করতে শুরু করেন। চিকিৎসক, ধর্মযাজক, আইনজীবী প্রভৃতিকে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পরচুলা ব্যবহার করতে হতো। পরচুলা দেখেই চেনা যেতো তিনি কোন পেশার লোক।

বর্তমানেও পরচুলার ব্যবহার প্রায় সব দেশেই অব্যাহত। পরচুলার পরিবর্তে ফল্স্ হেয়ার কথাটা বেশি চালু হয়েছে। যাঁদের মাথায় টাক পড়ে তাঁরা অনেকেই ফল্স্ হেয়ার ব্যবহার করেন। চুলকে মাথার ভূষণ মনে করা হয়। চুল উঠলে তথা টাক পড়তে শুরু করলে টাকে চুল গজায় না। না, কোন কোবরেজী ভিটামিনযুক্ত তেলের সাধ্য নেই। বিজ্ঞানও বিশেষ কিছু সুরাহা করতে পারেনি। তবে শোনা যাচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে বংশগত কারণ ঐ টাকপড়াকে রোধ করতে পারবে।

রঙ্গমঞ্চ

রঙ্গমঞ্চকে আমরা থিয়েটারের ঘর বলে থাকি। এককালে মানুষের অবসর বিনোদনের ঐ একটিমাত্র উপায়ের প্রচলন হয়েছিল। যাত্রা, সিনেমা ইত্যাদি অনেক পরের ঘটনা। রঙ্গমঞ্চে কোন নাটক মঞ্চস্থ করা হতো এবং নাটকের কুশীলবরা সেজেগুজে অভিনয় করতেন। মানুষ দেখে আনন্দলাভ করতো।

রঙ্গমঞ্চের পরিকল্পনা প্রথম গ্রীকরাই করেছিলেন। এর পেছনে একটা পটভূমিকাও আছে। গ্রীকদের একজন দেবতার নাম ছিল ডাইওনিসাস। ডাইওনিসাসের প্রতি

গ্রীকদের শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। প্রতি বছর ঐ দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এক উৎসবের আয়োজন করা হতো। প্রথম প্রথম উৎসবের প্রধান অঙ্গ চিল নাচ এবং গান। পরে অভিনয়ের প্রচলন হয়। সে অভিনয় ছিল ভারি অদ্ভুত ধরনের। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অভিনেতারা মুখোশ পরে অভিনয় করতেন। পুরুষেরাই মেয়ে সাজতেন। মানুষকে হাসানো এবং আনন্দদানই ছিল অভিনয়ের উদ্দেশ্য। প্রথম প্রথম হাসিতামাসাযুক্ত মিলনান্ত নাটক অভিনীত হলেও পরে বিয়োগান্ত নাটক ও অভিনয় হতে শুরু করে।

গ্রীসে অভিনয় বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তবে পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে কাউকে থিয়েটারে যেতে হতো না। আনুমানিক ৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে এথেনসের অ্যাক্রোপোলিশ নামক একটি দুর্গের কাছে স্থাপিত হয়েছিল সাধারণ রঙ্গমঞ্চ। একেবারে খোলা জায়গায়। একসঙ্গে বিশ হাজার দর্শক অভিনয় দেখতে পারতেন। সাধারণতঃ দেবদেবীদের নিয়েই নাটক রচিত হতো এবং মঞ্চে দেবদেবীদের উপস্থাপন করারও কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল।

গ্রীক আমলে ভারতেও রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়েছিল। সংস্কৃতে লেখা নাটকই অভিনীত হতো। অনেকের মতে ভারতে রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করা হয়েছিল গ্রীকদের অনুকরণে। বিতর্ক অবশ্য আছে। তবে অনেকে মনে করেন, গ্রীকবীর আলেকজান্ডার ভারতের যে অংশটুকু জয় করেছিলেন সেই অংশের উপর গ্রীক প্রভাব পড়েছিল এবং সেই অঞ্চলেই প্রথম শুরু হয়েছিল অভিনয়। তারপর ধীরে ধীরে ভারতের অন্যান্য জায়গায় রঙ্গমঞ্চ গড়ে উঠে এবং সংস্কৃত নাটক অভিনয় হতে শুরু করে।

গ্রীকদের পর ইওরোপে নাটক অভিনয় একরকম বন্ধ হয়ে যায়। খ্রীস্টজন্মের বহু পরে ইংলণ্ডে প্রথম অভিনয় শুরু হয়। তখন ইংলণ্ডের মানুষ খ্রীস্টধর্মাবলম্বী। ঈস্টার উৎসব তাঁরা জাঁকজমকভাবে পালন করতে শুরু করেন। যীশুর মহান বাণীসমূহকে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য যীশুরই জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনাগুলো অভিনয় করতো। ঐ অভিনয় গীর্জায় গীর্জায় প্রদর্শন করা হতো। কোন রঙ্গমঞ্চ তখনও গড়ে উঠেনি।

পণ্ডিতদের মতে, গীর্জায় অভিনীত যীশুর জীবনের কাহিনীগুলো দেখতে খুবই ভালবাত জনসাধারণ। তাই শুরু হয় অন্য ধরনের চিন্তা-ভাবনা। যীশুর কাহিনী ছাড়াও রচিত হতে শুরু করে নাটক এবং গড়ে উঠে প্রকৃত রঙ্গমঞ্চ। সেসব নাটকও ছিল অদ্ভুত ধরনের এবং প্রদর্শনও করা হতো বিচিত্রভাবে। রঙ্গমঞ্চ বলতে ছিল একটা উঁচু কাঠের বেদি। তার উপর থাকতো কয়েকটা ছোট ছোট ঘর। ঐ ঘরের মধ্যেই দৃশ্যগুলো অভিনীত হতো। ঘরগুলো ছিল স্বর্গ, নরক ও পৃথিবীর প্রতীক। নরকের দৃশ্য সবার মনকে জয় করতো। অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে ভূতপ্রেতদের নৃত্য

প্রদর্শিত হতো।

প্রকৃত নাটক লেখা শুরু হয় ইওরোপে রেনাসাঁসের যুগে। ঐ সময় রঙ্গমঞ্চও স্থাপিত হয়। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের খুব একটা উন্নতি সাধন হয়নি। এমনকি সেক্সপীয়রের আমলেও। তারপর এর জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে শিল্পীরা রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে নানা ধরনের পরিকল্পনা করেন। মাঝে অবশ্য অলিভার ক্রমওয়েল অভিনয় প্রদর্শন বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে রমরম করে জমে উঠে রঙ্গমঞ্চ। এতদিনে স্ত্রীভূমিকায় অভিনয়ের জন্য পুরুষের পরিবর্তে মেয়েদেরও আনানো হয়েছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইতালীতেও রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়েছিল এবং একই ধারা প্রচলিত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স রঙ্গমঞ্চ ও নাটক উভয়েরই উন্নতি সাধন করেছিল। জার্মানেও সেসময় ছড়িয়ে পড়েছিল নাটক রচনা ও অভিনয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকৃতপক্ষে স্থাপিত হয় আধুনিক রঙ্গমঞ্চ। পাশ্চাত্যের অনুকরণে ভারতে কলকাতায় প্রথম রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়েছিল।

আদিম অস্ত্রশস্ত্র

প্রকৃতি মানুষকে উপহার দিয়েছিল অত্যন্ত অসহায় অবস্থায়। পশুকে দিয়েছিল শীতগ্রীষ্ম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গায়ে পর্যাপ্ত লোম। আত্মরক্ষার জন্য তীক্ষ্ণ দাঁত ও নখর, খাদ্যের জন্য দিয়েছিল তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর। কাউকে কাউকে বিষ দাঁত, বিষ নখরও দিয়েছিল। কিন্তু মানুষ তার কোনটিই পায়নি। শুধু একটি জিনিস সে পেয়েছিল—পশুদের তুলনায় অতি উন্নত মস্তিষ্ক এবং এই মস্তিষ্কের জোরেই সে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছিল।

মানুষ প্রথমেই আবিষ্কার করেছিল আত্মরক্ষার নিমিত্ত হাতিয়ার। সে হাতিয়ার প্রথমের দিকে কেবল পাথরের ছোট বড় নুড়িই ছিল। আত্মরক্ষা ও শিকার উভয় কাজেই ব্যবহার করতো। ছেলেবেলা থেকে অভ্যাস করতো পাথর ছোঁড়ার। গাছের ডালে বসে থাকা পাখি থেকে বড় বড় বন্যজন্তুকেও পাথর ছুঁড়ে ঘায়েল করতে পারতো। তারপরেই বুদ্ধি করে পাথরের ফলক বানিয়েছিল। যার মাথা মোটা এবং অগ্রভাগ ছুঁচালো। এটি ছিল তাদের প্রধান অস্ত্র এবং এই অস্ত্র নিয়ে দীর্ঘকাল তাদের কাটাতে হয়েছিল।

বাঁচার তাগিদে পুরাতন প্রস্তর যুগের মানুষ একদিন ঐ হাতিয়ার তৈরির উপরই সমূহ প্রতিভা নিয়োগ করেছিল বলা যায়। প্রচণ্ড পরিশ্রমে একদিন পাথরকে ফুটো করতেও সক্ষম হয়। সেই থেকে শুরু হয় পাথরের হাতিয়ার নির্মাণের নতুন যুগ। কাঠের হাতল পরিয়ে পাথরের কুডুল, বর্শা ইত্যাদি তৈরি করেছিল। আগুন

আবিষ্কারের পর এ কাজ আরও সুবিধাজনক হয়ে উঠেছিল। রকমারি অস্ত্র বানিয়েছিল পাথর দিয়ে।

তারপরেই শুরু হয় তীরধনুকের যুগ। গুহাগাত্রে অঙ্কিত ছবিগুলো প্রমাণ করে নব্যপ্রস্তর যুগের আগেই মানুষ তীরধনুক ব্যবহার করতো। তীরের ফলা ছিল পাথরের। ধনুক তৈরির উপায় কীভাবে যে আবিষ্কার করেছিল, তা সঠিকভাবে বলার উপায় নেই। তবে ঐ ধনুকের কাল বহুদিন অব্যাহত ছিল। এমনকি কামান বন্দুক আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত। ধনুকের কাল এখনও অব্যাহত। বিশেষ করে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে। কালে কালে ধাতু আবিষ্কৃত হলে পাথরের ফলার পরিবর্তে ব্যবহার করেছিল ব্রোঞ্জ ও লোহার ফলা। সম্ভবতঃ গ্রীকরাই ব্রোঞ্জ নির্মিত তীরের ফলা ব্যবহার করতেন। অবশেষে ধাতুকে কাজে লাগাবার পর তৈরি হয় তরবারি এবং সেইসঙ্গে ঢালও। প্রতিপক্ষের তরবারির আঘাত প্রতিহত করতেই ঢালের পরিকল্পনা।

প্রথম প্রথম ঢাল তৈরি হতো পশুর শক্ত চামড়া দিয়ে। মিশরীয়রাও যে সেসময় ঢাল ব্যবহার করতেন। তার প্রমাণ সেকালের আঁকা ছবিগুলো। পরের দিকে মনে হয় পশুর চামড়ার বদলে ব্যবহৃত হয়েছিল কাঠের ঢাল। গ্রীকরা ব্রোঞ্জের ঢাল ব্যবহার করলেও পরবর্তী রোমান আমলে কাঠের ঢাল প্রচলিত ছিল। লোহাকে কাজে লাগাবার পরই অস্ত্রশস্ত্রের হয়েছে অভাবনীয় উন্নতি। নানা ধরনের তরোয়াল, ছুরি, ছোরা, ঢাল অনেককিছুই। এখনও এদের ব্যবহার আছে।

সেসময় বুদ্ধি খরচ করে মানুষ আরও যে কত ধরনের শিকার করার অস্ত্র বানিয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা যায় না। বুমেরাং-এর কথা আগেই বলা হয়েছে। এটি অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত। তেমনই একটি হাতিয়ার আজও রেড ইন্ডিয়ানরা ব্যবহার করেন। যদিও রেড ইন্ডিয়ানদের সংখ্যা অনেক কম।

রেড ইণ্ডিয়ানদের আবিষ্কৃত শিকার ধরার অস্ত্র এক ধরনের ফাঁস। নাম ল্যাসো। বন্য পশুকে ধরতে গিয়ে তাঁরা কায়দা করে ফাঁস ছুঁড়ে দিতো। বুনো লতায় তৈরি ফাঁস। পশুর গলার দিকে ছুঁড়ে দিতো। ফাঁস গলায় আটকে গেলে সজোরে টান দিতো। অমনি পশুটা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে লুটিয়ে পড়তো মাটিতে।

যেকালের আদিবাসীরা হয়ত আরও কত ধরনের অস্ত্র আবিষ্কার করেছিল। অধিকাংশ ব্যবহার করা হতো পশু শিকারের কাজে। মানুষ যুদ্ধোন্মাদ হয়ে উঠলেই যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের দিকে ঝোঁক দেয়। ঢাল তরোয়াল থেকে গোলাবারুদ, বন্দুক-কামান, বোমা এবং শেষে পরমাণু বোমা ও জীবাণু বোমা। মিশরীয় আমল থেকেই মারণাস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা সমানে চলে আসছে।

কর্পূর

কর্পূর আমাদের খুবই পরিচিত। সুগন্ধিযুক্ত শাদা দানাদার পদার্থ। ইংরেজিতে বলে ক্যাম্‌ফর। এর সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য, গরম করলে সোজাসুজি বাষ্পে পরিণত হয়। কঠিন বস্তুকে গরম করলে প্রথম তরলে ও পরে বাষ্পে পরিণত হয়। কিন্তু কর্পূর, আয়োডিন প্রভৃতি তার ব্যতিক্রম। বাষ্পকে পুনরায় ঠাণ্ডা করলে সেই কঠিনেই রূপান্তরিত হয়। শিক্ষার্থীরা হামেশাই কর্পূরের ঊর্ধ্বপাতন করে থাকে। এটি রাসায়নিক পদার্থ এবং ফরমূলা $C_{10}H_{16}O$। গলনাঙ্ক ১৭৮° সেলসিয়াস।

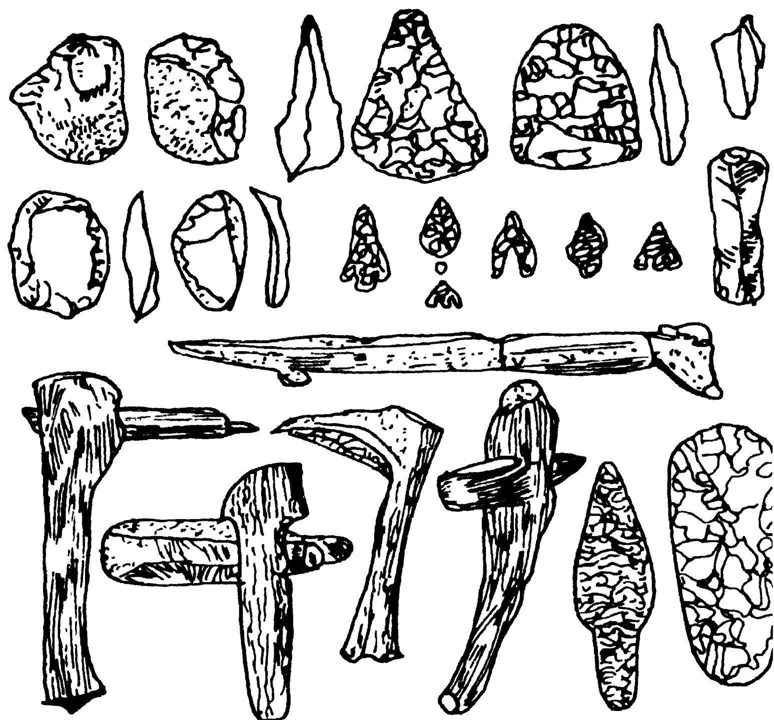
এক ধরনের গাছ থেকে কর্পূরকে সংগ্রহ করা হয়। বর্তমানে রসায়নের উন্নতির ফলে কৃত্রিমভাবেও তৈরি করা যায় কপূর্রকে। কর্পূর তার্পিন জাতীয় রাসায়নিক বলে কোন কোন দেশ তার্পিন তেলের উপাদান পাইনিন থেকেও সংশ্লেষণী পদ্ধতিতে কর্পূর তৈরি করে থাকে।

কর্পূর ভারতীয় আবিষ্কার। সুশ্রুত সংহিতায় কর্পূরের উল্লেখ আছে। সুপ্রাচীন আয়ুর্বেদশাস্ত্রে দেখা যায় কর্পূরকে ওষুধরূপে প্রয়োগের ব্যবস্থা ছিল। সর্দি, কাশি হলে কর্পূরের ঘ্রাণ নেওয়া, তেল সহ ফুটিয়ে গলায় মালিশ করা ইত্যাদি বহু প্রাচীন। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে কর্পূর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আরবীয় কিমিয়াবিদরা আবিষ্কার করেছিলেন। কথাটা কিন্তু ঠিক নয়।

কর্পূর কয়েক প্রজাতির গাছ থেকে পাওয়া যায়। একটি প্রজাতির কর্পূর গাছকে হিমালয়ের পাদদেশে জন্মাতে দেখা যায়। প্রাচীন ভারত গাছটিকে আবিষ্কার করেছিল এবং কর্পূর সংগ্রহের উপায়ও আবিষ্কার করেছিল। ঐ গাছের জন্মস্থান কিন্তু আরব নয়। মার্কোপোলোর বর্ণনাও সেই কথা প্রমাণ করে। তিনি উল্লেখ করেছেন, ভারতেও চীনদেশে কর্পূর ব্যবহারের প্রচলন আছে।

অপরদিকে কর্পূর গাছের কোন কোন প্রজাতি সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও প্রভৃতি দ্বীপেও জন্মাত। বাংলার পালযুগে ভারতের সঙ্গে ঐসব দ্বীপের একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সপ্তডিঙা সাজিয়ে বহু বণিক সেইসব দ্বীপে বাণিজ্যের কারণে যাতায়াত করতেন। গড়েছিলেন ভারতীয় উপনিবেশ। বণিকেরা অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে কর্পূরকেও ভারতে নিয়ে আসতেন। সেখানকার কর্পূর গাছ একটু অন্য ধরনের। ''বরস'' নামের গাছের আঠাই কর্পূর। অবশ্য অশোধিত কর্পূর। নাম ভীমসেন কর্পূর। অতি সহজে সংগ্রহ করা যেতো বলে বণিকেরা বহে আনতেন। বাঙালিরা সেকালে তাম্বুলের সঙ্গে কর্পূর মশলা হিসেবে ব্যবহার করতেন। তার প্রমাণ চর্যাপদ থেকে লাভ করা যায়। চর্যাপদগুলো রচিত হয়েছিল খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীর দিকে। আরবীয়দের উত্থানের প্রায় তিনশ' বছর আগে।

সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে যে প্রজাতির কর্পূর গাছ জন্মাতো, হিমালয়ের পাদদেশে সে প্রজাতির কর্পূর গাছ জন্মাতো না। হিমালয়ের প্রজাতিটির আঠা থেকে কর্পূর পাওয়া যায় না। গাছের ডাল থেকে সংগ্রহ করা হয়। ডালকে কেটে প্রথমে টুকরো



টুকরো করা হয়। তারপর জলে ভিজিয়ে দেওয়া হয়। এবার জলসহ কাঠকে খুব ভালভাবে সেদ্ধ করার পর ছেঁকে পৃথক করে নেওয়া হয় জলকে। ঐ জল থেকেই সংগ্রহ করা হয় কর্পূরকে। সেই কবে কোন আদিকালেই আবিষ্কৃত হয়েছিল এই পদ্ধতি এবং এখনও সেই একই পদ্ধতিকে অনুসরণ করা হয়।

কর্পূরের ব্যবহার বেশ ব্যাপক। ওষুধ শিল্পে তো বটেই, প্লাস্টিক শিল্পে, সুগন্ধি প্রস্তুতিতে, বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুতিতে এবং জীবাণুনাশক হিসেবেও ওর ব্যবহার অব্যাহত। পৃথিবীর অনেক দেশে তাই কর্পূর গাছের চাষ হয়। চীন, ভারত, জাপান প্রভৃতি দেশ তাদের অন্যতম। ভারতের হিমালয় ও নীলগিরি অঞ্চলেই বর্তমানে চাষ করা হচ্ছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, কর্পূর গাছের নানা প্রজাতি রয়েছে। সুমাত্রা, বোর্নিও প্রভৃতি দ্বীপে যেসব কর্পূর গাছ জন্মায় তারা দিপতেরোকারপাসিস্ট গোত্রের

দিওবালানপস আরোমাতিকা। এটি দ্বিবীজপত্রী গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। হিমালয় অঞ্চলে যারা জন্মায় তারা কম্পোমিতি গোত্রের ব্লুমেয়াবালসামিফেরা। এরাও গুল্মজাতীয় এবং দ্বিবীজপত্রী।

কর্পূরের জন্য যে প্রজাতির গাছের চাষ হয় তার বৈজ্ঞানিক নাম সিন্নামোমম কামফোরা। বেশ বড়সড় গাছ। উচ্চতায় পঁচিশ থেকে ত্রিশ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। গুঁড়ির বেড় হয় তিন মিটারের মত। গাছের বয়স কম করে চল্লিশ বছর না হলে পর্যাপ্ত কর্পূর পাওয়া যায় না। গাছ যত পুরনো হয় ততই তার সকল অংশে তৈলকোষ উৎপন্ন হয় এবং প্রতিটি তৈলকোষে কর্পূর জমে। এক একটা গাছ থেকে পাঁচ কিলোগ্রামের মত কর্পূর পাওয়া যায়।

বর্ম

বর্মের সাহায্যে শরীরকে আচ্ছাদিত করে শত্রুর কবল থেকে আত্মরক্ষার উপায় স্বয়ং বিশ্বপ্রকৃতিই ইতর প্রাণীদের শিখিয়েছিল। সেই কবে কোন আদিকাল থেকে এখনও শঙ্খ, শামুক, প্রবাল, কাঁকড়া চিংড়ি প্রভৃতিরা আপন শরীরের চারদিকে বর্ম তৈরি করে আসছে। মাছদের পূর্বপুরুষরাও ছিল বর্মধারী। ডাঙার কিছুকিছু প্রাণীরও বর্মাবৃত শরীর। স্থল শামুক তো বটেই, প্যাঙ্গোলিন, আর্মাডিলো, গণ্ডার প্রভৃতিদের দেহেও বর্মের মত জিনিস থাকে এবং এই বর্মও তাদের আত্মরক্ষার অন্যতম এক হাতিয়ার।

প্রকৃতি মানুষকে আত্মরক্ষার কোন উপকরণই প্রদান করেনি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, প্রকৃতি দয়া করে তাকে বুদ্ধিমান করে তুলেছিল। তাই আত্মরক্ষার উপকরণ সে নিজেই আবিষ্কার করেছিল। সেই উপকরণগুলোর মধ্যে বর্মও একটি। অরণ্যবাসের সময়ই মানুষ হিংস্র জন্তুদের কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য আবিষ্কার করেছিল পশুচর্ম এবং বাকলের আচ্ছাদন তথা বর্ম। যেহেতু তাদের কেবলমাত্র শিকারের উপর নির্ভর করতে হতো এবং সবসময় বনে বনে ঘুরে বেড়াতে হতো তাই সম্মুখীন হতে হতো বহু হিংস্র জন্তুর। কখনও প্রাণ দিতে হতো, কখনওবা ক্ষতবিক্ষত হতে হতো। ক্ষত বিষিয়ে উঠলেও মৃত্যুবরণ করতে হতো। তাই একদিকে যেমন ক্ষত নিরাময়ের জন্য লতাপাতার সন্ধান করতে হতো অপরদিকে হিংস্র জন্তুর দাঁত ও নখরের আঘাত যাতে শরীরকে স্পর্শ করতে না পারে তার জন্য বুকে হাতে ও পায়ে গাছের শক্ত বাকলকে বেঁধে ঘোরাফেরার কথা চিন্তা করেছিল। কাজে লাগিয়েছিল পশুচর্মকেও। আদিম বর্ম ঐ বাকল এবং পশুচর্ম।

পশুচর্মের দ্বারা তৈরি বর্ম দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। প্রচলিত ছিল পুরাতন প্রস্তর যুগ থেকে নব্যপ্রস্তর যুগ, নগর সভ্যতার যুগ এমনকি রোমানদের আমল পর্যন্তও। পরিবর্তনও কিছু এসেছিল। যেমন নগর সভ্যতার যুগে সৈনিকরা যে পশুচর্ম নির্মিত বিশাল ঢাল ব্যবহার করতেন তাও বর্মেরই নামান্তর।



বর্মের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন গ্রীক ও রোমানরা। গ্রীকরা সৈনিকদের জন্য ব্রোঞ্জের বর্ম নির্মাণ করেছিলেন। মাথায় শিরস্ত্রাণের তলায়, পায়ের হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত এবং বুকে পাতলা ব্রোঞ্জের পাত ভালভাবে এঁটে নিতেন। ব্রোঞ্জের তৈরি জামাও কেউ কেউ ব্যবহার করতেন। যে জামা এমনভাবে তৈরি করা হতো, যাতে অতি সহজে হাতের চেটো ও কনুই, পায়ের হাঁটু ইত্যাদিকে ভাঙতে কোন অসুবিধা হতো না। তার উপর যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁরা ব্রোঞ্জ নির্মিত ঢালও ব্যবহার করতেন। প্রতিপক্ষের তরবারির আঘাত সহজে সেই বর্মকে ভেদ করতে পারতো না।



রোমানরা বর্মকে আরও একধাপ এগিয়ে দিয়েছিলেন। পশুচর্মকে ভালভাবে পরিষ্কার করে গলা থেকে হাঁটুর তলা অবধি সুন্দর ফুলহাতা জামা তৈরি করতেন।

তারপর সেই জামায় এঁটে দিতেন লোহার পাত। কনুইয়ের কাছে এমন কারিগরি থাকতো যে হাতকে সহজে চালনা করতে কোন অসুবিধা হতো না। মাথায় লোহার শিরস্ত্রাণও পরতেন। সম্ভবত লোহার বর্ম ও শিরস্ত্রাণ রোমানদেরই আবিষ্কার। রোমানদের তৈরি শিরস্ত্রাণে মুখমণ্ডলের অধিকাংশই ঢাকা পড়ত।

ইওরোপের রেনাসাঁসের যুগে বর্মের আরও উন্নতি হয়। ইস্পাত সুলভ হওয়ায় বর্ম নির্মাণে ইস্পাতের ব্যবহার শুরু হয়। রোমানদের লোহার পাতের জামার মতই বেশ চকমকে ইস্পাতের জামা। রাজা-মহারাজা, নাইট প্রভৃতিরা পরতেন ঐ জামা। বেশ জমকালো জামা। যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোড়ার গায়েও ইস্পাতের বর্ম ঐ সময় বেঁধে দেওয়া হতো।

ভারতেও বহু আগে থেকে বর্মের প্রচলন ছিল। তবে তাদের বর্মের উপাদান কী ছিল, তা সঠিকভাবে বলা যায় না। পৌরাণিক কাহিনীগুলোতে বর্মের উল্লেখ থাকলেও বর্মের উপাদান সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নেই। গ্রীকদের সংস্পর্শে আসার আগে হয়ত ভারত ব্রোঞ্জ ও লোহাকে বর্ম তৈরির কাজে নিয়োগ করেছিল। কারণ গ্রীকদের আগে ভারত উন্নত মানের লোহা যেমন আবিষ্কার করেছিল, তেমনই তামা এবং ব্রোঞ্জকে ভালভাবে কাজে লাগিয়েছিল।

যুদ্ধে বন্দুক কামান ব্যবহার শুরু হলে পুরাতন সেইসব বর্ম এবং শিরস্ত্রাণ সম্পূর্ণভাবে অকেজো হয়ে পড়ে। তখনই চেষ্টা চলে বন্দুকের গুলি নিরোধক বর্ম তথা বুলেটপ্রুফ কোন ধাতুর অনুসন্ধান। দীর্ঘকাল ধরেই চলেছিল অনুসন্ধান পর্ব। কিন্তু মানুষ সফল হতে পারেনি। প্রথমে তৈরি করেছিল হালকা ধাতু অ্যালুমিনিয়ামের চাদর এবং পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লোহা ও ম্যাঙ্গানিজ ধাতু মিশিয়ে তৈরি করেছিল সঙ্কর ধাতু। ঐ সঙ্কর ধাতুটির দ্বারা নির্মিত বর্ম বৈমানিকরাই ব্যবহার করেছিলেন।

প্রকৃত বুলেটপ্রুফ বর্ম তৈরি হয়েছে একেবারে আধুনিককালে জৈব রাসায়নিক প্রযুক্তির চরম বিকাশের দিনে। অত্যন্ত হালকা এবং দৃঢ় ও মজবুত। বন্দুকের গুলিও তাকে ভেদ করতে পারে না এমন এক পদার্থ। এটি এক ধরনের কৃত্রিম তন্তু। নাম কেবলার-২৯। আজকের সবদেশের রাষ্ট্রনায়কদের নিরাপত্তার জন্য ঐ বুলেটপ্রুফ দিয়েই গাড়ি তৈরি করা হয়। অঙ্গাবরণও তৈরি করা হচ্ছে কেবলার-২৯কে ব্যবহার করে।

আজকে চারদিকেই শিরস্ত্রাণ এবং বর্মের রমরমা। সাধারণ মোটর সাইকেল চালক থেকে মহাকাশচারী সবাই। মহাকাশযানকেও বর্মের দ্বারা আচ্ছাদিত করতে হয়। তবে মহাকাশচারীদের বর্ম বা পোশাক এবং মহাকাশযানের আচ্ছাদন কেবলার-২৯ দিয়ে তৈরি করা হয় না। মহাকাশচারীর পোশাক তথা স্পেস স্যুট অ্যালুমিনিয়াম

সঙ্কর দিয়ে তৈরি করা হয়। অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঐ পোশাক। তাপনিরোধক তো বটেই, পোশাকের অভ্যন্তরে থাকে অক্সিজেন সরবরাহ ও কার্বন-ডাই অক্সাইডের শোষণের ব্যবস্থা। একটা স্পেস স্যুট বানাতে খরচ পড়ে প্রচুর—যা কোন রাষ্ট্র ছাড়া একক কোন মানুষের পক্ষে তৈরি করা সম্ভব হয় না। মহাকাশযানের বর্ম তথা আচ্ছাদনও ভারি অদ্ভুত ধরনের। একটা নয়, অনেকগুলি আচ্ছাদন পরপর থাকে। দুই আচ্ছাদনের মধ্যে সামান্য ফাঁকও রাখা হয়। আচ্ছাদনগুলো তৈরি করা হয় কাচতন্তু দিয়ে। কালে কালে নবরূপে আরও কত বর্ম আত্মপ্রকাশ করবে।

আজব প্রাণী ডলফিন

ডলফিনকে নিয়ে আজকের দিনে ছোটদের জল্পনাকল্পনার যেন বিরাম নেই। দৈবক্রমে এক আধটা ধরা পড়লে বা মারা পড়লে প্রচার মাধ্যমগুলো একই সঙ্গে সরব হয়ে উঠে এবং কৌতূহলী হয়ে উঠে মানুষ। দীর্ঘপথ অতিক্রম করে দেখতেও ছোটেন অনেকে।

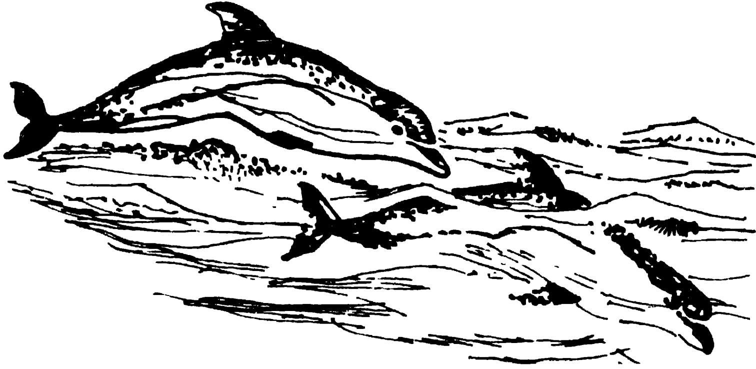
ডলফিন সত্যই এক আশ্চর্যজনক প্রাণী। আগে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেতো। কিন্তু স্বার্থপর মানুষ তাদের প্রায় নিঃশেষ করে এনেছে। ওদের গায়ের প্রচুর চর্বির জন্য। যে চর্বি আমাদের বিলাসোপকরণ নির্মাণের জন্য ব্যবহার করা হয়। এবং ঐ একটি প্রধান কারণের জন্য বর্তমানে তিমি ও ডলফিন শেষ দিনের প্রতীক্ষায় বসে আছে।

ডলফিন সামুদ্রিক প্রাণী। বেশ কয়েকটা প্রজাতি আছে। কোন কোন প্রজাতির ডলফিন নদীতেও বাস করে। ওদেরই আমরা চলতি কথায় শুশুক বলি। ওরা জলে বাস করে বটে, কিন্তু মাছ নয়। স্তন্যপায়ী। সিতাসিঙ্গ বর্গের প্রাণী। পণ্ডিতদের মতে তিমিদের মত এরাও এককালে সমুদ্র থেকে ডাঙায় উঠে এসেছিল; নৈসর্গিক কোন কারণে জলে বাস করার সমূহ বৈশিষ্ট্য অবলুপ্ত হওয়ার আগে পুনরায় জলে নেমে গেছে।

ডলফিন অনেকের কাছে অজানা হলেও প্রাণীটি আবিষ্কৃত হয়েছে অনেক আগে। সম্ভবত নগর সভ্যতার যুগে। নদীতীরে বাস করার সময় প্রাণীটিকে দেখেছিল এবং কৌতূহলীও হয়েছিল। তবু প্রকৃত গবেষণা বলতে যা বোঝায় তা কিন্তু হয়নি। শুধু কতকগুলো কাহিনী প্রচলিত ছিল। এদের সম্বন্ধে প্রকৃত গবেষণা হয়েছে অনেক পরে—গ্রীকদের আমলে। বিশেষ করে গ্রীক দার্শনিক ও বিজ্ঞানী অ্যারিস্তোতলের দ্বারা।

মনে হয়, অ্যারিস্তোতল ডলফিনদের নিয়ে দীর্ঘকাল গবেষণা করেছিলেন এবং

এদের সম্বন্ধে বহু তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছিলেন। সম্ভবতঃ এর মূলে প্রচলিত বহু কাহিনীই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। কাহিনীগুলের মধ্যে বহুল প্রচারিত কাহিনীটি ছিল বীর টেলিম্যাকাসকে ঘিরে। টেলিম্যাকাস ছিলেন প্রখ্যাত গ্রীকবীর অডিসিয়ুসের পুত্র। যখন তাঁর বয়স ১১ বছর সেই সময় একদিন তিনি রক্ষীপরিবৃত হয়ে নৌকাযোগে নদীতে পরিভ্রমণ করছিলেন অথবা নদী পার হচ্ছিলেন। হঠাৎ মাঝনদীতে নৌকাটি ডুবে যায়। এমন সময় কোথা থেকে একটি ডলফিন ছুটে এসে কিশোর টেলিম্যাকাসকে পিঠে তুলে নেয় এবং ছেড়ে দিয়ে আসে নদীর তীরভূমিতে হাঁটু জলে। ডলফিনটির কৃপায় সে যাত্রায় প্রাণে বেঁচে যান টেলিম্যাকাস। তাই কৃতজ্ঞতাবশতঃ তিনি আজীবন পোশাকের উপর এঁটে রাখতেন একটি ডলফিনের ছবি।



অ্যারিস্তোতল গবেষণার পর স্থির করেছিলেন, ডলফিনদের পক্ষে সবই সম্ভব। ওরা বুদ্ধিমান প্রাণী এবং মানুষকে খুবই ভালবাসে। তাই অ্যারিস্তোতল ওদের নাম রেখেছিলেন "পবিত্র প্রাণী"।

ডলফিনদের সম্বন্ধে প্লিনিও গবেষণা করেছিলেন। তিনিও উল্লেখ করেন, ডলফিনরা মানব শিশুকে অত্যন্ত ভালবাসে। ছোটদের ভালবাসার একটা গল্পও প্লিনি উল্লেখ করেছেন। একটি কিশোরকে প্রতিদিন একটা ছোট হ্রদ ঘুরে ইস্কুলে যেতে হতো। সেই হ্রদে বাস করতো একটি ডলফিন। কিশোরটির হাঁটার কষ্ট দেখে ব্যথিত হয়েছিল ডলফিনটি। সে কিশোরের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করেছিল এবং সেই থেকে প্রতিদিন পিঠে করে হ্রদ পার করে দিতো। গল্পটি কতদূর সত্য তা জানা যায় না। তবে ঐ কিছুকাল আগে ভৌগোলিক আবিষ্কারের যুগে সমুদ্রের নিমজ্জিত চড়ায় যাতে অভিযাত্রীদের জাহাজ ধাক্কা না খায় তার জন্য একটি ডলফিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিয়মিত জাহাজের পথনির্দেশ করতো জাহাজের সামনে ভেসে ভেসে। অনেকেই লিপিবদ্ধ করেছেন সেই কাহিনী।

আর ছোটদের প্রতি ডলফিনদের ভালবাসা? এ সত্যও বর্তমানের জীববিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন। কোন কোন দেশ বড় বড় জলাধার তৈরি করে ডলফিন প্রতিপালন করে। ওরা ছোটদের সঙ্গে যেন হৈ-হল্লা শুরু করে দেয়। খুব আমুদে প্রকৃতির প্রাণী। মুখ দিয়ে সুন্দর বাঁশির মত শব্দ করে। ছোটরা জলে বল ছুঁড়ে মারলে ওরা লুফে নেয় এবং ফিরিয়ে দেয় ডাঙায় তাদেরই কাছে। গবেষকদের মতে ডলফিনদের বুদ্ধি আছে এবং সহজে পোষও মানে। বুদ্ধি ও বিবেচনায় প্রাণিজগতে মানুষের পরেই ডলফিনদের স্থান।

ডলফিনদের মুখটা হাঁসের মত। ওরা মাঝে মাঝে লাফায়। ভারি সুন্দর সে লাফ দেওয়ার ভঙ্গি। দল বেঁধে থাকতেই ভালবাসে। কোন কোন প্রজাতি দুজনের জোট বেঁধে থাকে। হাঁসের মত ঠোঁট যাদের তারা লম্বায় নয় মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। কোন কোন প্রজাতি লম্বায় মাত্র তিন মিটার পর্যন্ত। বেশির ভাগ গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের বাসিন্দা। সমুদ্রের অন্যান্য জায়গায়ও থাকে।

ডলফিনরা মানুষকে এত ভালবাসে, তবু মানুষের দয়া ওর পায়নি। এখনও মানুষ সুযোগ পেলেই আন্তর্জাতিক নিয়ম ভঙ্গ করে হত্যা করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। আশ্চর্য মনুষ্যচরিত্র!

সোরা

সোরা নামটি ভারতীয়। সেই কোন আদিকালে ভারতীয় কিমিয়াবিদরা আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু ওর রাসায়নিক উপাদান আবিষ্কার করতে পারেননি। ওর ব্যবহার ছিল। ব্যবহার করা হতো চিকিৎসা ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য কাজেও। সম্ভবতঃ চীনাদের আবিষ্কারেরও আগে। তবে কোন দেশের আবিষ্কারকের নাম পাওয়া যায় না।

সোরা পটাসিয়াম নাইট্রেট ছাড়া অন্য কিছু নয়। আণবিক সঙ্কেত KNO_3। প্রচলিত নাম নাইটার ও সল্টপিটার। একে প্রকৃতিতে বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। তবে সব দেশে নয়। ভারতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেতো বলে প্রাচীন ভারতীয় গবেষকরা ওর গুণাগুণ পরীক্ষা করেছিলেন।

পটাসিয়াম নাইট্রেট তথা সোরা বাংলা ও বিহারে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেতো। সেই প্রাচীনকাল থেকেই গ্রাম বাংলার কৃষক সোরাকে সার রূপে প্রয়োগ করে আসছিলেন। সোরা যে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে — এই সত্য অনেক আগেই ধরা পড়েছিল। অনেক সময় সোরার বিকল্পও প্রস্তুত করতেন। আবর্জনাস্তূপের উপর প্রচুর পরিমাণে ছাই ছড়িয়ে বছরের পর বছর ফেলে রাখতেন। আবর্জনা পচে তৈরি হতো উত্তম সার। ঐ সার জীবাণুদের ক্রিয়ায় উৎপন্ন পটাসিয়াম নাইট্রেট সহ অন্যান্য নাইট্রেট।

পাশ্চাত্যে মধ্যযুগের পটাসিয়াম নাইট্রেটের খুব চাহিদা ছিল। কারণ, সোরা তথা পটাসিয়াম নাইট্রেট বারুদ তৈরির প্রধান উপকরণ। বারুদ তথা গান পাউডারের উপকরণ ৬ ভাগ সোরা, ১ ভাগ গন্ধক ও ১ ভাগ কার্বন। এটি একটি মিশ্রণ। অগ্নিসংযোগে বিস্ফোরণ ঘটে। মধ্যযুগে যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে কামান ও বন্দুকের ব্যাপক ব্যবহার পাশ্চাত্যকে সোরা সন্ধানে যত্নবান হতে হয়। বৃটিশ আমলেও ভারতীয় সোরার প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল, পাশ্চাত্যের বাংলা ও বিহারের সাধারণ মানুষ পোড়ো জায়গাগুলো থেকে লোনাধরা মাটি সংগ্রহ করে মহাজনের কাছে বিক্রি করতেন। ঐ মাটি থেকেই সেদিন সোরা নিষ্কাশন করা হতো। তাছাড়া ভারতের বিভিন্ন জায়গায় সোরার ভাণ্ডার ছিল। পাশ্চাত্যের বণিক সম্প্রদায় ভারতে পা দিয়েই বুঝেছিল, এখানে আছে অফুরন্ত সোরার ভাণ্ডার। প্রকৃতিতে পাপ্ত সোরার মধ্যে যথেষ্ট অশুদ্ধি থাকতো। তারা অশুদ্ধিগুলোকে তাড়িয়ে বেশ উন্নত মানের সোরা তৈরি করে নিতো। মোগল বাদশাহরা এমন উন্নত মানের সোরা তৈরি করতে জানতেন না। পরের দিকে তাই ভারতের সোরার কদর ছিল বিশ্বব্যাপী।

ভারতীয় সোরার চাহিদা কমে যায় চিলি সল্ট পিটারের খোঁজ পাওয়ার পরে। আমেরিকা আবিষ্কারের পরে পাশ্চাত্যের অভিযাত্রীরা সারা উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা যেন চষে বেড়িয়েছিল। পরের দিকে হানা দিয়েছিল আমেরিকার দুর্গম অঞ্চলেও। সেই রকমই একটি দুর্গম অঞ্চল ছিল দক্ষিণ আমেরিকার চিলির আতাকামা মরুভূমি। মরুভূমিতে পা দিয়ে তারা বুঝতে পারে, এখানে সোডিয়াম নাইট্রেটের অফুরন্ত ভাণ্ডার। নাম রেখেছিল চিলি সল্টপিটার ($NaNO_3$)। সোডিয়াম নাইট্রেট থেকে পটাসিয়াম নাহট্রেন্ট তৈরি করা খুব একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল না। পাশ্চাত্যে সিলডাইন (KCl), কার্নালাইট ($KCl, MgCl_2, 6H_2O$) প্রভৃতি খনিজ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বিশেষ করে জার্মানীর স্টাসফার্ট খনিজ স্তূপে। পটাসিয়াম ক্লোরাইডের (KCl) উষ্ণ ও গাঢ় দ্রবণ চিলি সল্টপিটারের সঙ্গে মিশিয়ে তৈরি করা হতো সোরা বা পটাসিয়াম নাইট্রেট ($NaNO_3 + KCl \rightleftharpoons KNO_3 + NaCl$)। উৎপন্ন সোডিয়াম ক্লোরাইড কেলাসিত হয়ে যায়। দ্রবণে থাকে পটাসিয়াম নাইট্রেট। দ্রবণটিকে ছেঁকে নিয়ে ঠাণ্ডা করলে (32^0C) পটাসিয়াম নাইট্রেট কেলাসের আকারে পাওয়া যায়।

বর্তমানে অবশ্য সোরার সে কদর নেই। আজও বারুদের ব্যবহার অব্যাহত আছে এবং চাহিদাও প্রচুর। তবে প্রাকৃতিক সোরার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। এর কদর ফুরিয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বাতাসের নাইট্রোজেনকে কাজে লাগিয়ে অ্যামোনিয়া উৎপাদনের পরে পরেই। নাইট্রেট ঘটিত রাসায়নিক সারও তৈরি করা হচ্ছে কৃত্রিমভাবে। কৃষকদের আবর্জনা পচিয়ে বা সোরাকে সরাসরি জমিতে ফেলে জমির উৎপাদন শক্তি বাড়াতে হয় না। বলাবাহুল্য আমেরিকার আদিম অধিবাসী সেই রেড ইণ্ডিয়ানরাও জানতেন চিলি সল্টপিটার ভাল সার। তাঁরা

মরুভূমি থেকে বহে এনে কৃষিজমিতে ফেলতেন। বর্তমানে এত কষ্ট আর কোন দেশের কৃষককে করতে হয় না। আবর্জনাকেও পচাতে হয় না, বা সল্টপিটারকে খুঁজে এনে প্রচুর শ্রম করে জমিতে ফেলতে হয় না। হাতের কাছেই মোয়া। রাসায়নিক নাইট্রোজেন ঘটিত সার ঢেলে দাও, আর ফসল তোল।

বর্তমানে পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে রাসায়নিক সার পর্যাপ্ত পরিমাণে ঢালা অন্যায়। ওতে জমি তার নিজস্ব ক্ষমতা হারায়, মাটির ক্ষয় হয় এবং ফসলে বহু অবাঞ্ছিত পদার্থ সঞ্চিত হয়। তাই পুনায় জোর দেওয়া হচ্ছে সেই প্রাকৃতিক উপাদানগুলোর উপর। সেই আবর্জনা পচানো সার, সেই প্রকৃতিতে লাভ করা সল্টপিটার ইত্যাদি। অর্থাৎ সারের ব্যাপারে আবার আমরা ফিরে দাঁড়িয়েছি আদিকালের মানুষের তৎপরতার দিকে।

অপরদিকে ব্যাকটিরিয়াদের নিয়েও বর্তমানে বিস্তর গবেষণা হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় যে সব ব্যাকটিরিয়া আবর্জনাকে নাইট্রেট সারে রূপান্তরিত করতে পারে — তাদের শনাক্ত করতে পেরেছেন। তৈরি করেছেন জীবাণু-সার। জীবাণু চাষের মাধ্যমে আবর্জনাকে পচিয়ে একদিকে যেমন উন্নত মানের সার তৈরি করা যাচ্ছে, অপরদিকে তেমনই উপজাত হিসেবে বিদ্যুৎ ও লাভ করা সম্ভব বলে জানিয়েছেন অনেকে। যদিও গবেষণাগুলো এখনও প্রাথমিক স্তরে আছে বলতে হবে। চাহিদা অনুযায়ী জীবাণু-সার ও বিদ্যুৎ কোনটিই উৎপাদন করা যাচ্ছে না। হয়ত কিছুকাল পরেই লাভ করা যাবে।

কোহিনুর মণি

সাধারণের বিশ্বাস, মণি সাপের মাথায় থাকে। আগেকার দিনে লেখা কোন বিদেশের বহু সাহিত্যেও অনুরূপ উক্তি আছে। কিন্তু না। অত্যুজ্জ্বল হীরকখণ্ডকেই মণি বলা হয়। আর পৃথিবীর সেরা মণি "কোহিনুর"।

কোহিনুর মনি প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভারতেরই আবিষ্কার। শুধু কোহিনুর নয়, সেকালের বহু হীরকখণ্ডের হদিস পেয়েছিল ভারত। রত্ন পাথর হিসেবে ব্যবহার ছাড়াও প্রাচীন ভারত হীরককে রোগ নিরাময়ের কাজে ব্যবহার করতো। কুষ্ঠরোগ আরোগ্যের জন্য প্রদান করা হতো হীরকভস্ম। তাছাড়া অন্যান্য অনেক রোগেও হীরকভস্মকে প্রয়োগ করা হতো। অতি প্রাচীনকালে লেখা চিকিৎসাবিষয়ক সংহিতাগুলিই প্রমাণ করে হীরকও প্রথম ভারতীয়রা ব্যবহার করেছিল।

হীরক খনিতেই পাওয়া যায়। পৃথিবীর বহু জায়গায় হীরকখনি আছে। তবে স্রোতবাহিত পাথরখণ্ডের মধ্যেও হীরকের কেলাস লাভ করা যায়। প্রাচীন ভারত হয়ত পাথরখণ্ড থেকেই প্রথম হীরক লাভ করেছিল। তারপর হদিস পেয়েছিল হীরকখনির। হীরক সাধারণত অক্টাহেড্রন, ডোডেকাহেড্রন, প্রভৃতি রূপে কেলাসিত হয়।

হীরকের উপাদান কার্বন ছাড়া অন্য কিছু নয়। কঠিনতম পদার্থ এবং এর ঘনত্ব ৩.৫১। এর সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য, প্রাথমিক অবস্থায় হীরককে হীরক বলে সহজে চেনা যায় না। সাধারণ একটুকরা পাথরের মত দেখতে লাগে। ওকে পালিশ করার পর ছেনি দিয়ে পল কাটলেই অত্যুজ্জ্বল হীরকখণ্ডরূপে প্রতিভাত হয়। ''জহুরীরা জহর চেনে'' কথাটা পুরোপুরি সত্য। এবং ঐ কারণে প্রাচীন কালের মানুষের সোনার প্রতি যতখানি আকর্ষণ ছিল ততখানি হীরকের প্রতি ছিল না। প্রাচীন সুসভ্য দেশগুলোও সম্ভবত অলংকার শিল্পে হীরককে ব্যবহার করতো না। তার কারণ, পল কাটার পদ্ধতি তাদের জানা ছিল না। এই পদ্ধতি ভারতেরই আবিষ্কার। অতি প্রাচীনকালে ভারত হীরকের খনিও সম্ভবত আবিষ্কার করেছিল।

ভারতের পৌরাণিক কাহিনীতে মণির কথা আছে। প্রসিদ্ধ মণিরূপে চিহ্নিত হয়েছিল স্যমন্তক মণি। ঐ মণিটি সত্রাজিৎ নামে একজন রাজার সম্পদ ছিল। সত্রাজিতেরা দুই ভাই। সত্রাজিৎ ও প্রসেনজিৎ। সত্রাজিৎ মণিটিকে সযত্নে রেখেছিলেন। একদিন ভাই প্রসেনজিৎ সত্রাজিতের মণিটিকে নিজ গলায় ধারণ করে শিকারে যান। এক সিংহ প্রসেনজিৎকে হত্যা করে স্যমন্তক মণি লাভ করে। তারপর সিংহকে হত্যা করে জাম্ববান মণির অধিকারী হয়। এদিকে চারদিকে খবর রটে যায়, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ স্যমন্তক মণির লোভে প্রসেনজিৎকে হত্যা করেছেন। বিনা দোষে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রও কলঙ্কিত হয়েছিল এবং কলঙ্ক থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মণির সন্ধান করেন। শেষে জাম্ববানের কাছে সন্ধান পান। যুদ্ধ করে উদ্ধার করেন স্যমন্তক মণি। জাম্ববান আপনকন্যা জাম্ববতীকে দান করে সন্ধি করেন। শ্রীকৃষ্ণও মণিটি নিয়ে প্রদান করেন সত্রাজিৎকে। শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্ক মোচন হয় এবং লাভ করেন সত্রাজিতের কন্যা সত্যভামাকে। সত্রাজিৎ জৌতুক হিসেবে মণিটি কৃষ্ণকে দান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ গ্রহণ করেননি।

স্যমন্তক মণিকে ঘিরে সেইদিনই বহু দুর্ঘটনা ঘটেছিল। এটি সত্রাজিতেরই আবিষ্কার। শোনা যায় সত্রাজিতের বহু হীরকখণ্ড ছিল। তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, স্যমন্তক। সত্রাজিতের আমলেই হীরক কাটা, পালিশ করা এবং হীরকের পল কাটার শিল্প গড়ে উঠেছিল। অনেকের মতে সত্রাজিতের হীরকের স্যমন্তক মণিই প্রসিদ্ধ কোহিনুর মণি। যদি তাই হয়, তাহলে সত্রাজিতের পরে মণিটি কত যে হাত বদল হয়েছিল তার কোন ঠিকঠিকানা নেই। পুরাণ ও ইতিহাস দুই-ই নীরব এখানে। অনেক পরে ইতিহাস থেকে জানা যায়, বাবর আগ্রা দুর্গ থেকে লাভ করেছিলেন মহামূল্যবান একটি হীরকখণ্ড। বাবর তাঁর আত্মজীবনীতেই উল্লেখ করে গেছেন। এটি নাকি রাজপুত রাণা বিক্রমাদিত্যের পারিবারিক সম্পদ ছিল। লুণ্ঠিত মণি-পুত্র হুমায়ুনের জন্মদিনে উপহার দিয়েছিলেন বাবর। সেই থেকে মণিটি মোগলদের ধনভাণ্ডারেই রক্ষিত ছিল। বিখ্যাত ফরাসী পর্যটক ট্যাভার্নিয়েরের বর্ণনা থেকে জানা যায়, ঔরঙ্গজেবের তোশাখানায় তিনি একখানি অমূল্য হীরকখণ্ড দেখেছিলেন। তিনি

হীরকখণ্ডটির নামকরণ করেছিলেন "গ্রেট মোগল"।

মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহের আমলে পারস্য সম্রাট নাদির শাহ্ ভারত আক্রমণ করেন এবং লুণ্ঠন করেন মোগল রত্নভাণ্ডার। লাভ করেন সেই আশ্চর্যজনক মণিটি। তিনিই মণিটির নাম দেন "কোহিনুর"।

নাদির শাহের ধনভাণ্ডার ও কোহিনুরকে ধরে রাখতে পারেনি। চলে যায় আফগানিস্তানের বাদশাহ শাহসুজার হাতে। শাহসুজার হাত থেকে সংগ্রহ করেন রনজিৎ সিংহ। রনজিৎ সিংহের পুত্র দলীপ সিংহের কাছ থেকে লাভ করে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি। কোম্পানি মণিটি উপহার স্বরূপ প্রদান করেন মহারানী ভিক্টোরিয়াকে। তখন মণিটির ওজন ছিল ১৮৬$\frac{১}{১৬}$ ক্যারেট (১ ক্যারেট = 0 2 গ্রাম)। আবার পালিশ করা হয় মণিটিকে। পালিশ করার পর ওজন হয় ১০৬ ক্যারেটের মত। কয়েকটি টুকরায় ভাগও করা হয় কোহিনুরকে। একটি খণ্ড বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। বাকি খণ্ডগুলো শোভা পাচ্ছে ইংলণ্ডের রাজমুকুটে।

কোহিনুরকে কোন পুরুষ অঙ্গে ধারণ করলে তার চরম ক্ষতি হয় এমনকি মৃত্যুও পর্যন্ত হতে পারে। এমনই একটা সংস্কার প্রচলিত ছিল। কোহিনুরের ইতিহাসও যেন এই সত্যটি প্রমাণ করে। ঐ কারণেই মহারানী ভিক্টোরিয়া একটা আইনও প্রণয়ন করে গেছেন। কোহিনুর মণিখচিত রাজমুকুট কোন সম্রাট পরতে পারবেন না। যখন কোন সম্রাজ্ঞী সিংহাসনে বসবেন, তিনিই ধারণ করবেন ঐ মুকুট।

যাই হোক না কেন, হীরক-শিল্প ভারতেই উদ্ভূত হয়েছিল এবং ভারতই প্রথম ব্যবহার করেছিল হীরক। পরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে হীরক-শিল্প গড়ে উঠেছিল। নাদির শাহের আমল পর্যন্তও বিদেশে হীরক দুষ্প্রাপ্য ছিল। অনেক পরে হীরকখনি আবিষ্কৃত হয়েছে। ব্রাজিল, ট্রান্সভাল, সিয়েরালিওন, সাইবেরিয়া, অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট প্রভৃতি বহু দেশ হীরক খনির জন্য প্রসিদ্ধ। ভারতেও আছে। আগে গোলকুণ্ডায় নাকি হীরকখনি ছিল। প্রাচীনকাল থেকে উত্তোলিত হতে শুরু করায় বর্তমানে সেখানে আর হীরক নেই। সম্ভবত স্যমন্তক মণির মালিক সত্রাজিৎ ঐ খনি থেকেই হীরক উত্তোলিত করেছিলেন। স্যমন্তক মণিই হোক অথবা কোহিনুর মনিই হোক অথবা অভিন্ন একই মণি হোক— উত্তোলিত হয়েছিল গোলকুণ্ডার হীরকখনি থেকেই। অনেকে মনে করেন, দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণা নদীর অববাহিকায় আগে বহু হীরকের টুকরো পাওয়া যেতো। মহানদীর তীরভূমিতেও। ভারতে বর্তমানে একমাত্র চালু হীরকখনি মধ্যপ্রদেশের পান্নায় অবস্থিত।

হারিয়ে যাওয়া দেশ

নৈসর্গিক নানা কারণে কত দেশ, কত নগর-রাজ্য-রাজধানী, কত দ্বীপ-উপদ্বীপ-বদ্বীপ, কত নদী-উপনদী এমনকি সাগর এবং উপসাগর ও হারিয়ে গেছে। তাদের সবার হদিস কিন্তু পাওয়া যায় না। পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলো থেকেই কিছু কিছু

তথ্য লাভ করা যায়। ইতিহাস এখানে নীরব। যেমন ভারতের বুক থেকে হারিয়ে গেছে তমসা, মালিনী, সরযূ, সরস্বতী, দৃষদ্বতী প্রভৃতি কত নদী। হারিয়ে গেছে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বেট দ্বারকা, সম্ভবত রাবণের রাজধানী স্বর্ণলঙ্কাও। আর্যরা যে সময় ভারতে এসেছিলেন— সে সময় রাজস্থান মরু ও মরুপ্রায় অঞ্চল ছিল না। বন, উপবন ও শস্যশ্যামলা প্রান্তরে ভরা ছিল। পরের দিকে মরুভূমির সৃষ্টি হওয়ায় নদীগুলো হারিয়ে গেছে। টিকে আছে প্রাচীনতম সাহিত্যগুলিতে।

সৃষ্টিও হয়েছে নতুন নতুন কত নদী, কত দ্বীপ, কত পর্বত। ভূতাত্ত্বিকদের বিবরণ অনুযায়ী এককালে আল্পস, হিমালয় প্রভৃতির মত ভঙ্গিল পর্বতের অস্তিত্বই ছিল না। আজ থেকে হয়ত মাত্র ৬ কোটি বছর আগে হিমালয়ের জন্ম। এখনও মাঝে মাঝে মহাসমুদ্রের বুকে এক একটা দ্বীপকে জেগে উঠতে দেখা যায়। আবার নিমজ্জিতও হয়ে যায়।

অনেকেই জানেন, আজকের পৃথিবীর স্থলভাগগুলো চলমান অবস্থায় রয়েছে। চলার বিরাম নেই কারও। সেই কবে কোন আদিকাল থেকে কোটি কোটি বছর ধরে চলতেই আছে। চরৈ বেতি— এগিয়ে চলার প্রতিযোগিতা (চলমান মহাদেশের কথা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনী অংশে বর্ণনা করা হয়েছে)। ভূ-তাত্ত্বিকদের মতে আদিতে পৃথিবীর সমূহ স্থলভাগ এক সঙ্গে যুক্ত ছিল। ভেঙেছে, চলতে শুরু করেছে, পুনরায় একত্রিত হয়েছে। আবার চলতে শুরু করেছে — মহাসাগরের বুকে দূরে দূরান্তরে। ঐ কারণে মহাসাগরের বুকে হারিয়েও গেছে বেশ কিছু দেশ। তাদের মধ্যে মাত্র দু-একটির সন্ধান পেয়েছেন আজকের গবেষকরা। হারিয়ে যাওয়া দেশগুলোর মধ্যে আটলান্টিস এবং প্যাসিফিকা প্রধান।

আটলান্টিস খুব বেশিদিন আগে হারিয়ে যায়নি। হয়ত আজ থেকে সাত আট হাজার বছর আগে ওর অস্তিত্ব ছিল। বিদেশের কোন কোন পৌরাণিক কাহিনীতে ওকে একটি সমৃদ্ধ দেশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম আটলান্টিস্ সম্বন্ধে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক প্লেটো (খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী)। প্লেটোও উল্লেখ করেছেন, আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে একটা মস্তবড় দেশ ছিল। মানুষজনও বাস করতো সে দেশে এবং সেখানকার মানুষ এক উন্নত সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। প্লেটো অবশ্য উল্লেখ করেছেন, আকাশ থেকে একটা তারা ছুটে এসে দেশটিকে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে।

প্লেটোর বিবরণী সেদিন অনেককে উৎসাহিত করেছিল। কিন্তু কেউ কোন খোঁজখবর করেননি। সম্ভবও ছিল না সেকালে এবং বিজ্ঞানেরও এত উন্নতি হয়নি। খোঁজখবর শুরু হয় একরকম আধুনিক কালেই। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে প্রথম গবেষণা। শুরু করেন ইগনেসাস ডরেলি নামে জনৈক মার্কিন গবেষক। কথিত আছে, অবলুপ্ত আটলান্টিস সম্বন্ধে তিনি একটা রোমাঞ্চকর কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং বইটি পড়ে অনেকে আটলান্টিস সম্বন্ধে উৎসাহ বোধ করেছিলেন। তবু কেউ তদন্তে

নামেননি।

আটলান্টিস সম্বন্ধে প্রকৃত খোঁজখবর শুরু হয় বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে। অনুসন্ধানের কাজ প্রথম শুরু করেন হেনরিজ মোখ নামে জার্মান নৌবাহিনীর জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে আটলান্টিকের বুকে অভিযানের পর অভিযান চালান। শেষে অনেক কষ্টে আটলান্টিস নামক অবলুপ্ত দেশটির হদিস পান। তারপরই তিনি রচনা করেন "দি সিক্রেট অব্ আটলান্টিস" নামক একটি বই। বইটি প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল।

হেনরিজ যদিও তাঁর বইতে আটলান্টিসের অবস্থানের কথা উল্লেখ করেছিলেন, তবুও অনেকে অবলুপ্ত এই দেশটি সম্বন্ধে আরও তথ্য উদ্ধার করার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেন এবং অভিযান চালান। অভিযাত্রীরা দীর্ঘকাল গবেষণার পর স্থির করেন, আটলান্টিসের অস্তিত্ব একদিন অবশ্যই ছিল। হয়ত সমৃদ্ধ এক জনপদও ছিল। কিন্তু বিভ্রান্তি দেখা দেয় ওর অবস্থানকে নিয়ে। হেনরিজ যেখানটায় ওর অবস্থানের কথা উল্লেখ করেছিলেন সেই স্থানটিকে অনেকে মেনে নিতে পারলেন না। গড়ে ওঠে দুটি মতবাদ। একদলের মতে আটলান্টিসের অবস্থান ছিল বতর্মানের জিব্রাল্টার প্রণালীর কাছে। অপর দলের মতে আজকের অ্যাজোর্স দ্বীপপুঞ্জই অবলুপ্ত আটলান্টিসের জেগে থাকা কতকগুলো পাহাড়ের চূড়া।

গবেষকদের মতে আটলান্টিসের আয়তন ছিল ৪৮ হাজার বর্গ কিলোমিটার। অবলুপ্ত হয়ে গেছে আজ থেকে অন্ততঃ ১২ হাজার বছর পূর্বে। বিগত তুষার যুগের শেষের দিকে। অনেকের মতে, তুষার যুগে বরফের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছিল সারা দেশটি।

আটলান্টিসের হারিয়ে যাওয়ার মূলে অনেকেই উল্কা পতনকে দায়ী করেছেন। প্লেটোও অনুরূপ মন্তব্য করেছিলেন। উল্কাপতনকে আজও অনেকে "তারাখসা" বলে থাকেন। একটা মাঝারি গোছের উল্কাপিণ্ড অথবা একসঙ্গে অনেকগুলি উল্কার বর্ষণ ঐ অঞ্চলে ঘটেছিল। এর ফলে শুধু আটলান্টিস নয়, উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলভাগও বসে গেছে। এর প্রভাবে একটা বড় রকমের বিপর্যয়ও এসেছিল। ঐ অঞ্চলে আবিষ্কৃত কয়েকটা বড় বড় গহ্বরকে উল্কাবর্ষণের নিদর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছেন তাঁরা। সবচেয়ে বড় গহ্বরটির গভীরতা প্রায় ত্রিশ হাজার ফুট। ঠিক তার আশেপাশেই রয়েছে ছোট-বড় আরও কয়েকটা গহ্বর।

দ্বিতীয় আর একটি অবলুপ্ত দেশের নাম প্যাসিফিকা। পৃথিবীর স্থলভাগগুলো চলমান অবস্থায় থাকার জন্য এটির উদ্ভব ও পরে বিলীন হয়েছে। মহাদেশগুলো সচল থাকার দরুন মহাদেশের কোন কোন অংশ কখনও কখনও ভেঙ্গেছে, ভাঙ্গা অংশগুলোর কেউ কেউ হারিয়েছে, কেউ একা একাই দূরে দূরে সরে গেছে, আবার কেউ কেউ অপর কোন স্থলভাগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কোটি-কোটি বছর ধরে চলছে এই ভাঙ্গাগড়ার খেলা। গবেষকদের অনুমান, আজ থেকে কুড়ি কিংবা

বাইশ কোটি বছর আগে অস্ট্রেলিয়ার উত্তর পূর্ব উপকূলে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে একটা বৃহৎ স্থলভাগ ছিল। সেটি পরবর্তীকালে ভাঙ্গতে শুরু করে। ভাঙ্গার কাজ চলেছিল আজ থেকে প্রায় ৬ কোটি বছর আগে পর্যন্ত। সেই সময় সম্ভবতঃ পাঁচটি টুকরায় পরিণত হয়েছিল। তারপরেই সচল হওয়ার দরুন চারটি টুকরা অন্যান্য কয়েকটা দেশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে এবং সবচেয়ে বড় টুকরাটা। অবলুপ্ত তথা তলিয়ে গেছে প্রশান্ত মহাসাগরের তলায়। ঐটিই প্যাসিফিকা। স্থলভাগগুলো যে সত্য সত্যই চলমান অবস্থায় রয়েছে তার প্রমাণ ইওরোপ থেকে গ্রীণল্যাণ্ড ও আমেরি থেকে ট্রেলিয়ার দূরত্ব প্রতি বছর পরিমাপ করে বিজ্ঞানীরা স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন। আর ঐ একই কারণে প্রতি বছর আল্পস ও হিমালয়ের উচ্চতা বাড়ছে—দু'পাশের স্থলভাগ কাছাকাছি এগিয়ে আসার জন্য তলার পলিতে (অবলুপ্ত টেথিস সাগর) চাপ পড়ছে।

মাত্র কয়েক হাজার বছর আগেও ভারতের পূর্ব উপকূলভাগ থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে কয়েকটা দ্বীপ পাশাপাশি অবস্থান করতো। তাতে জনবসতিও ছিল। ইতিহাস ওর কোন হদিস দিতে পারেনা। কারণ প্রাগৈতিহাসিক যুগেই নিমজ্জিত বা ধ্বংস হয়ে গেছে। অনুমান করা হয় পুরাণে বর্ণিত ঋষি অগস্ত্যের কাহিনী থেকে। অগস্ত্য ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং তিনিই প্রথম আর্য— যিনি বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করে দাক্ষিণাত্যে উপনীত হয়েছিলেন। তামিল ভাষার প্রবর্তক হিসেবে আজও অগস্ত্যের নাম করা হয়। তিনিই দাক্ষিণাত্যে আর্যসভ্যতার বিস্তার ঘটিয়েছিলেন এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলে দুর্ধর্ষ এক জাতিকে (অসুর) দমন করে স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিলেন। ঐ দুর্ধর্ষরা দিনের বেলায় সাগরের দ্বীপগুলোতে পালিয়ে যেতো এবং রাতে দ্বীপগুলো থেকে এসে (হয়ত নৌকাযোগে) উপকূলভাগে মানুষদের উপর চড়াও হতো। বিন্ধ্যের অগস্ত্যপ্রণাম ও অগস্ত্যের সমুদ্র শাসন কাহিনী দুটিকে রূপক হিসেবে গ্রহণ করলে প্রকৃত সত্য ধরা পড়ে। কাহিনীটি যে রূপক-তা বর্তমানে প্রমাণিত হয়েছে এবং আবিষ্কৃত হয়েছে নিমজ্জিত শৈলশিরা।

রাবণের লঙ্কাপুরীও সম্ভবতঃ নিমজ্জিত একটি দ্বীপ অথবা বতর্মানের মালদ্বীপ। মালদ্বীপ থেকে ভারতের দক্ষিণ উপকূলভাগ পর্যন্ত একটা নিমজ্জিত শৈলশিরার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। শেষ হয়েছে উপকূল থেকে সামান্য দূরে। দূরত্বটা এত কম যে, অনায়াসে যে কেউ যাতায়াত করতে পারতো। কাছেই দণ্ডকারণ্য। শূর্পনখা এবং রাবণের অনুচররা হামেশাই বেড়াতে আসতে পারতো।

যাই হোক কালে কালে অনেক দেশ ভেঙেছে, কিছু কিছু অংশ নিমজ্জিতও হয়েছে। এখনও জাগে নতুন নতুন দ্বীপ এবং হারিয়েও যায়। বিশেষ করে প্রশান্ত মহাসাগরে। পৌরাণিক কাহিনীগুলোকে একেবারে অবহেলা করা যায় না। সেগুলো নিয়ে এখনও গবেষণার প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে ভূ-তাত্ত্বিকদের। ভারতের পুরাণসমূহে বর্ণিত অসুর, রাক্ষস ইত্যাদি দুর্ধর্ষ আদিম অধিবাসী ছাড়া যে অন্য কেউ

নয়— সে বিষয়ে সবাই আজ একমত।

সবশেষে বলতে হয় যে ধ্বংস-সৃষ্টি, সংযুক্তি-বিচ্ছিন্নতা প্রাকৃতিক নিয়ম। এই একই সুর যেন ধ্বনিত হয়েছিল উপনিষদে। আজ বিজ্ঞানীদের মুখেও সেই একই কথা। উপনিষদে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বকে বিশ্লেষণ করলে আজকের বৈজ্ঞানিক সত্যেরই সঙ্গে অনেকটা .মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, পৃথিবীর জলভাগ একটিই। বিচ্ছিন্ন কেবল স্থলভাগগুলো। অথচ এরা সবাই একদিন সংযুক্তই ছিল। মহাকাশের দিকে লক্ষ্য করলেও ধরা পড়ে বাসিন্দারা বিচ্ছিন্ন, অথচ একটিই মহাকাশ। ঘনসন্নিবিষ্ট মেঘমল্লার আকারে বাসিন্দারাও একদিন সংযুক্ত ছিল। পৃথিবীর সমূহ স্থলভাগ একদিন সংযুক্ত হবে, আবার বিচ্ছিন্নও হবে। মহাকাশের বাসিন্দাদের ক্ষেত্রেও সেই সত্য প্রযোজ্য। কোন কিছুরই অবলুপ্তি নেই। শুধু রূপান্তর।

বস্তুর গতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্য

অতি প্রাচীনকাল থেকে নিউটনের পূর্ব-পর্যন্ত মহাকর্ষের নিয়মের কথা কারও জানা ছিল? শুধু ভারতের বৈদিকযুগের ঋষিরা বিশ্বসৃষ্টির আদি কথা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, সৃষ্টির পূর্বে কোন কিছুই ছিল না। ছিল শুধু গাঢ় অন্ধকার এবং সেই অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল তরঙ্গায়িত আদিম কালো জল। তার আদি ছিল না, অন্তও ছিল না। জন্ম ছিল না, মৃত্যুও ছিল না। ছিলেন শুধু একজন। তিনি ছিলেন নিষ্প্রাণ অথচ নিজ ধর্মে অটল ও প্রাণবন্ত। এই 'তিনি' বলতে মহাকর্ষ কি না কে জানে!

কোপার্নিকাস গ্যালিলিওর আমল পর্যন্তও মানুষের ধারণা ছিল, পৃথিবী স্থির। ঈশ্বরের অমোঘ বিধানে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্ররা পৃথিবীর চারদিকে পরিক্রমা করছে। সবাই ধরে নিয়েছিল, পৃথিবীর আধার আছে। শুধু দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় বিজ্ঞানী ভাসুরাচার্য উল্লেখ করেছিলেন, "পৃথিবীর কোন আধার নেই। মহাশূন্যে ভাসমান। খসে পড়তে পারে না। পড়লে যাবেই বা কোথায়? চারদিকেই তো মহাশূন্য।"

পৃথিবীর অভিকর্ষ সম্বন্ধেও নিউটনের পূর্বে কেউ ইঙ্গিত দেননি। ভারী বস্তু উপর থেকে নিচে পড়ে যায়, কোন বস্তুতে শক্তি প্রয়োগ করলে গতিপ্রাপ্ত হয়, ইত্যাদির মূলে কোন যুক্তি কেউ দিতে পারেন নি। শুধু গ্রীক পণ্ডিত ডিমোক্রিটাস অনেক ভাবনাচিন্তার পর উল্লেখ করেছিলেন, বিশ্বপ্রকৃতির বস্তুরাশি ও ঘটনাবলীর মধ্যে একটা শৃঙ্খলা বিদ্যমান এবং সে শৃঙ্খলা সুনির্দিষ্ট। তিনি আরও বলেছিলেন, কোন ঘটনা আপনা থেকে ঘটতে পারেনা। বস্তুর গতিশীল হওয়ার ব্যাপারে তাঁর মতবাদ ছিল, বাহির থেকে বল প্রয়োগ করলেই বস্তু গতিশীল হয়। মহাকর্ষ বা অভিকর্ষের কথা কিছুই বলেননি। উপর থেকে বস্তু কেন নিচে পতিত হয়— সে ব্যাখ্যাও

ডিমোক্রিটাসের দর্শনে ছিল না।

বস্তুর গতিশীল হওয়ার ব্যাপারে ডিমোক্রিটাসের উক্তিকে সমর্থন করতে পারেননি অ্যারিস্তোতল। তিনি এক হাস্যকর যুক্তির (বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে) অবতারণা করেছিলেন। বলেছিলেন, প্রতিটি বস্তুর অবস্থানের নিজ নিজ এক একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে। উপর থেকে কোন বস্তুকে ছেড়ে দিলে সে মাটিতে পড়বেই। কাবণ, মাটিই বস্তুটির উপযুক্ত স্থান। ধোঁয়া উপরের দিকে উঠে, কারণ ধোঁয়ার-উপযুক্ত এলাকা আকাশ। এই প্রসঙ্গে তাঁর যুক্তি ছিল, সব বস্তুই স্থির অবস্থায় থাকতে চায় এবং স্থির অবস্থায় থাকাটাই বস্তুর ধর্ম। কিন্তু স্থির অবস্থায় কোন কিছু আসতে পারেনা। একমাত্র ঈশ্বর প্রাপ্তিতে স্থির অবস্থান আসে।

পতনশীল বস্তুর ক্ষেত্রে মন্তব্য করেছিলেন, প্রতিটি বস্তু অতি দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থানে আসতে চায়। যে বস্তু যত ভারী সে বস্তু তত দ্রুত তার অবস্থানে ফিরে আসে। তথা মাটিতে পড়ে স্থির অবস্থায় আসতে চায়।

পরবর্তীকালে অ্যারিস্তোতলের যুক্তিকে লুফে নিয়েছিল পাশ্চাত্য। যেহেতু ঈশ্বরের কথা আছে, তাই বেদবাক্যের মত গ্রহণ করেছিল ধর্মান্ধতার যুগের ইওরোপ আর যেহেতু অ্যারিস্তোতল বলেছেন, অতএব এর উপরে অপর কোন যুক্তি থাকতে পারে না। এই ধরণের একটা মনোভাবও গড়ে উঠেছিল। বোধহয় ঐ কারণে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত দ্বিতীয় কেউ গবেষণা করেননি।

বস্তুর গতি সম্বন্ধে অ্যারিস্তোতলের মতের প্রথম বিরোধিতা করেন সপ্তদশ শতাব্দীতে মহামতি গ্যালিলিও। অভিকর্ষের কথা তিনি অবশ্য বলেননি। তবে বস্তুর অবাধ পতনের ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। তিনি উল্লেখ করেন, উপর থেকে ভারী বস্তু ও হালকা বস্তুকে নিক্ষেপ করলে একমাত্র বায়ুর রোধের জন্য ভারী বস্তু আগে ও হালকা বস্তু পরে মাটিতে এসে পড়ে। এই উদ্দেশ্যে তিনি সর্বসমক্ষে একটা পরীক্ষাও করেন। পিসার হেলানো টাওয়ারের শীর্ষদেশ থেকে তিনি এক সঙ্গে একটি দশ পাউণ্ড ওজনের এবং একটি এক পাউণ্ড ওজনের নিরেট লোহার বল নিক্ষেপ করেন। দুটির ক্ষেত্রে বায়ুর রোধ সামান্য হওয়ায় দুটিই প্রায় একই সঙ্গে মাটিতে পড়েছিল।

উপরোক্ত পরীক্ষার পর গ্যালিলিও পতনশীল বস্তুর ক্ষেত্রে কয়েকটা সূত্রেরও অবতারণা করেন। প্রথমত, সব বস্তু সমান দ্রুততার সঙ্গে নিচের দিকে নেমে আসে, দ্বিতীয়ত, নির্দিষ্ট সময়ে তারা যে বেগ লাভ করে — তা অতিক্রান্ত সময়ের সমানুপাতী এবং তৃতীয়ত, নির্দিষ্ট সময়ে তারা যে বেগ লাভ করে তা অতিক্রান্ত সময়েব বর্গের সমানুপাতী।

গ্যালিলিওর পরে বিজ্ঞানী নিউটনই বস্তুর গতির নিয়ম পরিমাণগতভাবে তিনটি সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। সূত্র তিনটি নিউটনের গতিসূত্র নামে খ্যাত এবং শিক্ষার্থী মাত্রেই সূত্র তিনটির সঙ্গে পরিচিত। বস্তুর অবাধ পতন প্রমাণ করতে গিয়ে

তিনি প্রসিদ্ধ "গিনি পালকের" পরীক্ষা করেছিলেন। দেখিয়ে ছিলেন, বায়ুর রোধকে অপসারিত করলে ভারী মুদ্রা ও অত্যন্ত হালকা পালক একই সঙ্গে নিচে পতিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে বস্তুর গতিসূত্র গ্যালিলিও ও নিউটনের অবদান। উভয়ের পরীক্ষিত সিদ্ধান্তগুলোকে নিয়ে গড়ে উঠেছে গতিবিজ্ঞান। যদিও স্থির বস্তু প্রসঙ্গে ডিমোক্রিটাসের মতটাও বেশ গুরুত্বপূর্ণই ছিল। তবে বাস্তব পরীক্ষার কোন সাহায্য গ্রহণ করতে পারেননি তিনি।

ভারতের কল্পিত মহাপ্রলয় ও বিজ্ঞানীদের কল্পিত তুষার যুগ

অতি প্রাচীনকালে— যে সময় মানুষ প্রথম বিশ্বপ্রকৃতিকে নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছিল, তখনই প্রয়োগ করেছিল নানা ধরণের দার্শনিক মতবাদ। পরীক্ষালব্ধ বৈজ্ঞানিক মতবাদ নয়। তবু বহু দার্শনিক কেমন করে যেন বুঝতে পেরেছিলেন, পৃথিবীর বুকে মাঝে মাঝে ধ্বংসের যুগ আসে। বন্যা, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাতের মত এলাকাকেন্দ্রিক সাধারণ ধ্বংস নয়। পৃথিবীব্যাপী এক মহাবিপর্যয়। তাতে পুরাতন সৃষ্টি মুছে যায় এবং শুরু হয় নতুন করে সৃষ্টির কাজ। এটি ঈশ্বরের খেয়াল বা নির্দেশ বলেই উল্লেখ করতেন দার্শনিকরা।

বৈদিকযুগে ভারতবর্ষও অনুরূপ একটা কল্পনা খাড়া করেছিল। আর্যঋষিরা আরও একধাপ এগিয়ে ছিলেন। মনে করতেন, নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পৃথিবীর বুকে মহাদুর্যোগ কিংবা মহাপ্রলয় নেমে আসে। প্রলয়কালকে চিহ্নিত করেছিলেন যুগবিভাগের দ্বারা। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চার যুগ মিলে হয় এক মহাযুগ। সূর্য সিদ্ধান্ত মতে ৪৩ লক্ষ ২০ হাজার বছর। এবং ঐ সময়কালের পরে প্রলয় হয়। ৭১টি মহাযুগ একত্রে মন্বন্তর, ১৪ টি মন্বন্তরে এক কল্প ইত্যাদি। প্রতিটি মহাযুগের শেষে মন্বন্তরের শেষে, কল্পের শেষে মহাপ্রলয় হয়। ৮৬,৪০০ কল্পে হয় এক মহাকল্প। মহাকল্প অন্তে বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যায়।

বর্তমানের বিজ্ঞানীদের হিসেবে সময়ের হিসেবটা হয়ত মিলবে না। কিন্তু পৃথিবীর বুকে মাঝে মাঝে যে বিপর্যয় নেমে আসে— সে বিষয়ে সবাই একমত। নাম দেওয়া হয়েছে তুষারযুগ। তুষারযুগে বহু প্রাণী ও উদ্ভিদ হারিয়ে যায়। যারা কোনও প্রকারে টিকে থাকে, তারা প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। অর্থাৎ বিবর্তন আসে।

বহু তুষারযুগের হদিস পেয়েছেন গবেষকরা। ভূ-গর্ভে শিলাস্তরের স্তরবিন্যাস এবং প্রতি স্তরে প্রাপ্ত জীবাশ্মদের পরীক্ষা করে তাঁরা উপরোক্ত সিদ্ধান্তে এসেছেন।

আধুনিক উন্নত বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে শিলাস্তরের বয়সও নির্ধারণ করেছেন। লক্ষ্য করেছেন, কালে কালে পৃথিবীর বুকে বহু প্রাণী ও উদ্ভিদের আগমন হয়েছিল। কিছু কিছু সময় অন্তে তারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আবার এসেছে নতুন প্রাণী ও নতুন উদ্ভিদ। তবে সব প্রাণী ও উদ্ভিদ একসঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না। কিছু কিছু টিকে থাকে এবং বিপর্যয়ের মধ্যে বেঁচে থাকার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালানোর ফলে বংশধারার মধ্যে আসে পরিবর্তন। পুরাতন বলে চেনাই যায় না। সম্পূর্ণ অবলুপ্তও হয়ে যায় অনেকের বংশ।

ঐ মহাদুর্যোগ তথা তুষারযুগ হানা দেয় যেমন মন্থরগতিতে, তেমনই অপসারিত হতেও সময় লাগে বিস্তর। লক্ষ লক্ষ এমনকি কোটি কোটি বছর। শিলাস্তরে তার ছাপ স্পষ্ট এবং তারই ভিত্তিতে ভূতাত্ত্বিকরা প্রাণ সৃষ্টির আমল থেকে এ পর্যন্ত কতকগুলো মহাযুগে ও যুগে ভাগ করেছেন। তাঁদের মতে বিগত মাত্র ১০ লক্ষ বছরের মধ্যে কম করে পাঁচবার তুষারযুগ হানা দিয়েছে। সর্বশেষ তুষারযুগ অপসারিত হয়েছে আজ থেকে মাত্র হাজার দশেক বছর আগে। বিজ্ঞানীদের মতে তুষারযুগের অবসানের পর শুরু হয় উষ্ণযুগ এবং বর্তমানে আমরা উষ্ণযুগেরই বাসিন্দা।

প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকরা প্রলয় মহাপ্রলয়ের কথা উল্লেখ করলেও কারণ ব্যাখ্যা করেননি। সবটাই ঈশ্বরের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন। দীর্ঘকাল কোন বিজ্ঞানীও এ বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করেননি। যদিও পাশ্চাত্যের দার্শনিকরাও সেকালে অনুরূপ কোন মন্তব্যও করেননি। তুষারযুগের কল্পনা পাশ্চাত্যে একেবারে হাল আমলে বলা যায়। এ বিষয়ে প্রথম গবেষণা শুরু করেন ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে যুগোস্লাভিয়ার প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ মিলানকোচিভ। তিনি স্থির করেন, সূর্যের তাপ পৃথিবী কম লাভ করলেই পৃথিবীর বুকে তুষারযুগ নেমে আসে। প্রধানত, তিনটি কারণে মাঝে মাঝে পৃথিবী সূর্যতাপ কম লাভ করে এবং এটি ঘটে থাকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর।

প্রথমত, পৃথিবী যে পথে সূর্য পরিক্রমা করে, সে পথটা প্রায় এক লক্ষ বছর অন্তর অন্তর অনেক বেশি উপবৃত্তাকার হয়ে উঠে। তারপর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক পথে ফিরে আসে। যখন পথটা বেশি উপবৃত্তাকার হয়ে উঠে তখন সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব বেড়ে যায়। ফলে কম তাপশক্তি লাভ করে পৃথিবী।

দ্বিতীয়ত, পৃথিবী তার কক্ষপথের উপর খাড়াভাবে (লম্বভাবে) দাঁড়িয়ে পথ পরিক্রমা করছে না (ভারতীয় বিজ্ঞানী আর্যভট্টের আবিষ্কার বলে ধরা যেতে পারে)। কক্ষপথের উপর প্রায় সাড়ে তেইশ ডিগ্রী হেলান দেওয়া অবস্থায় আছে। অর্থাৎ কক্ষপথের উপর ২৩½° কোণ উৎপন্ন করেছে। ঐ কোণটা আবার সবসময় নির্দিষ্ট নয়। কিছুকাল অন্তর অন্তর বাড়ে এবং কমে। তৃতীয়ত, প্রায় পঁচিশ কিংবা ছাব্বিশ হাজাব বছবে পৃথিবীর মেরুদ্বয় একটা বৃত্তাকার পথে ঘুরে আসে। একে অয়ন চলন বলা হয়। অয়ন চলনের জন্য পৃথিবীর উত্তর মেরু সবসময় ধ্রুবতারার

দিকে নির্দিষ্ট থাকে না। প্রায় ছয় হাজার বছর পরে ধ্রুবতারার পরিবর্তে অন্য নক্ষত্রপুঞ্জকে স্থির মনে হবে। ঐ অয়ন চলনের জন্যও বিনতি কোণের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে এবং পৃথিবীতে আসা সূর্যতাপের পরিমাণেরও হ্রাসবৃদ্ধি হয়।

উপরোক্ত তিনটি কারণেই সূর্যের তাপমাত্রা কোন কোন সময়ে কম লাভ করে পৃথিবী। ফলে তুষারযুগ আসে। অপরপক্ষে তিনটি কারণ বিশেষ সময় অন্তে একই সঙ্গে ঘটে থাকে। তখন তুষারযুগ অতি ভয়ঙ্করভাবে হানা দেয়। প্রায় ১৫ থেকে ২০ কোটি বছর অন্তে অনুরূপ ঘটনা ঘটে। স্থায়ীও হয় লক্ষ লক্ষ বছর। সে এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয়। বিজ্ঞানীদের হিসেব অনুযায়ী ভয়ঙ্কর সব তুষারযুগ হানা দিয়েছে প্রায় ঐ সময়কালের অন্তর অন্তর। ৩৬ কোটি বছরের প্যালিওজোয়িক যুগে দুবার এবং মেসোজোয়িক যুগের শেষে একবার। বর্তমানে শুরু হয়েছে সেনোজোয়িক মহাযুগ। প্রায় ৬½ কোটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।

সে সময় মিলানকোচিভের তত্ত্বকে নিয়ে অনেকে গবেষণা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ফ্রেডরিক শর্টন। শর্টন উল্লেখ করেন, মিলানকোচিভ যে কারণগুলি উপস্থাপিত করেছেন সেই কারণগুলো ছাড়া অন্য কারণও আছে। তাদের মধ্যে অন্যতম একটি কারণ মহীচলন। পৃথিবীর স্থলভাগগুলো সচল থাকার জন্য এক এক সময় সেগুলো দুই মেরুর কাছাকাছি জড় হয়। মেরুদেশের কাছাকাছি হলেই শীতল হয় এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চল বরফে ঢাকা পড়ে।

ভূ-তত্ত্ববিদরাও কয়েকটা কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে প্রধান তিনটি কারণ উল্লেখ করা গেল।

(১) সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা সবসময় স্থির অবস্থায় নেই। সমুদ্রের জলপৃষ্ঠ ও ওঠানামা করে। ব্যবধান লক্ষ লক্ষ এমনকি কোটি কোটি বছর। শেষ তুষারযুগ হানা দেওয়ার সময় অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় সত্তর হাজার বছর আগে অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। সে সময় সমুদ্রপৃষ্ঠ নেমে গিয়েছিল অনেকখানি। মহাদেশগুলোর দূরত্বও আজকের মত এত বেশি ছিল না। কাছাকাছি ছিল এশিয়া ও আফ্রিকা। শ্রীলঙ্কা ভারতের সঙ্গে যুক্ত ছিল। যুক্ত ছিল ভারতের পূর্ব উপকূল থেকে বাংলা, মায়ানমার ও ইন্দোনেশিয়া। ইন্দোনেশিয়ার কাছাকাছি ছিল অস্ট্রেলিয়াও। বেরিং প্রণালীর সঙ্গে যুক্ত ছিল উত্তর আমেরিকা। এবং বেরিং প্রণালী বরফে ঢাকা পড়েছিল। তাই এশিয়া থেকে কোন এক গোষ্ঠীর মানুষ বেরিং প্রণালীর উপর দিয়ে হেঁটে উত্তর আমেরিকায় প্রবেশ করেছিল। ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতীয় উপকূলভাগ দিয়ে ইন্দোনেশিয়ায়, এমনকি অস্ট্রেলিয়ায়ও। বহু জীবজন্তুও ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে এশিয়া থেকে ইন্দোনেশিয়ায়।

অনেকের মতে বিগত তুষারযুগে পৃথিবীর উত্তর অক্ষাংশে তাপমাত্রা প্রায় ৭° সে. এর মত কমেছিল, কর্কটক্রান্তি অঞ্চলে কমেছিল ৪° সে.। অপরপক্ষে নিরক্ষ অঞ্চলে হ্রাস পেয়েছিল মাত্র ১° সে.-এর মত। ঐ কারণেই জীবজন্তুরা শীতল অঞ্চল

ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল নিরক্ষ অঞ্চলে। যারা যায়নি বা যেতে পারেনি তাদের বংশ লুপ্ত হয়ে গেছে। যেমন ম্যামথ, সেবরটুথড্ টাইগার প্রভৃতি। অথচ আফ্রিকার নিরক্ষ অঞ্চলের অরণ্যে জেব্রা, জিরাফ প্রভৃতিদের কিছুই হয়নি।

(২) পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের দিক পরিবর্তনের দরুনও তুষারযুগ হানা দিতে পারে। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র মহাকাশে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু একটা দিক বরাবর সবসময় প্রসারিত থাকে না। প্রতি ১০ লক্ষ বছরে ২ থেকে ৩ বার দিক পবিবর্তনের হার বেড়ে যায়। তখনই সূচনা হয় তুষারযুগের।

(৩) পৃথিবীর সঙ্গে সূর্য, সৌরজগৎ, এমনকি সূর্য যে ছায়াপথ বিশ্বের বাসিন্দা সেই ছায়াপথ বিশ্ব 'ও নিয়মের অধীন। তাকেও নিজ অক্ষের চারপাশে পাক খেতে হয়। সময়টা প্রায় ২৫ কোটি বছর। ঐ সময়ের কিছু আগে পৃথিবীতে তুষারযুগ আসে। কেননা সবার সঙ্গে সবারই গাঁটছড়া বাঁধা।

ওপিক নামে এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। তাঁর মতে সূর্যের তাপপ্রদান ক্ষমতারও হ্রাসবৃদ্ধি হয়। মহাকর্ষের নিয়ম অনুযায়ী সূর্যকেও তার ছায়াপথ বিশ্বকে পরিক্রমা করতে হচ্ছে। তারই ফলে তার তাপপ্রদান ক্ষমতা বাড়ে ও কমে। হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে চক্রাকারে। চক্রটা ২০ থেকে ৪০ লক্ষ বছর সূর্যের তাপপ্রদান ক্ষমতা কিছুটা হ্রাস পেলেই পৃথিবী কম তাপশক্তি লাভ করে এবং তখনই পৃথিবীর বুকে নেমে আসে তুষারযুগ।

বাতাসে জলীয়বাষ্প, কার্বন ডাই অক্সাইড প্রভৃতি গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ কমলেও পৃথিবী শীতল হয় এবং তুষারযুগ নামে। গ্রীণ হাউস গ্যাসগুলো পৃথিবীকে গরম রাখে। কোন কোন বিজ্ঞানী অনুমান করেছেন, জুরাসিকযুগের শেষে যে তুষারযুগ হানা দিয়েছিল তার মূলে ছিল বাতাসে জলীয়বাষ্পের ঘাটতি। ওঁদের মতে সে সময় একটা বড়সড় ধরণের গ্রহাণু বা উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়েছিল। ধূলি ও ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছিল পৃথিবীর আকাশ। বাতাসের সমূহ জলীয় বাষ্প ধূলিকণাকে আশ্রয় করে ঘনীভূত হয়ে ঝরে পড়েছিল পৃথিবীর বুকে। বাতাস জলীয় বাষ্প মুক্ত হওয়ায় শুরু হয়েছিল প্রবল শৈত্যপ্রবাহ। তাতে পৃথিবীপৃষ্ঠ ঢাকা পড়েছিল বরফে। অনেকের আরও ধারণা, আজ থেকে প্রায় ৩০ কোটি বছর আগে — কার্বনিফেরাম যুগে—যে যুগে বাতাসে কার্বনডাই অক্সাইডের প্রাচুর্য ছিল এবং অক্সিজেন ছিল নামে মাত্র, সে সময় অধিকাংশ কার্বনডাই অক্সাইড সাগর জলে দ্রবীভূত হওয়ায় ও কার্বনেট শিলায় রূপান্তরিত হওয়ায় বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ প্রচণ্ডভাবে হ্রাস পেয়েছিল। তারই ফলে নেমে এসেছিল তুষারযুগ। ঠাণ্ডায় ঘন বন পর্যন্ত বরফে ঢাকা পড়েছিল অনেকখানি। সবই ধ্বংস হয়ে গেছে। কালক্রমে তাদের উপর স্তরে স্তরে জমেছে পলি। রূপান্তরিত হয়েছে কয়লায়।

যাইহোক ভারতীয় দার্শনিকদের মতবাদ ও আজকের বিজ্ঞানীদের মতবাদ অনুযায়ী পৃথিবীর বুকে সুদীর্ঘকাল অন্তর অন্তর বিপর্যয় নেমে আসে। ভবিষ্যতেও আসবে। তথাপি বিজ্ঞানীরা তুষার যুগের কারণ সম্বন্ধে এখনও একমত হতে পারেননি। ভবিষ্যতে হানা দেবে কিনা সে সম্বন্ধেও আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে চান না। তবু দু-চারজন বলছেন, অতীতে যখন বার বার হানা দিয়েছে, ভবিষ্যতেও হানা দেবে। হয়ত মাত্র হাজার পাঁচেক বছর পরেই পৃথিবীর তাপমাত্র হ্রাস পেতে থাকবে। অপর দলের মতে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ যেভাবে বাড়ছে তাতে পৃথিবীর তাপমাত্রা সহসা হ্রাস পাওয়ার কথা নয়। কেউ বা বলছেন, যদি তুষার যুগ আসে তাহলে ৬০ কিংবা ৬৫ হাজার বছর পরে। ভবিষ্যতের কথা ভেবে কোন লাভ নেই। ভবিষ্যদ্বাণী তাই কেউ উচ্চারণ করতে চান না।

কস্তুরী ও কস্তুরীমৃগ

পৃথিবীর যাবতীয় সুগন্ধির মধ্যে কস্তুরীই সেরা এবং এটির পরিচয় অতি প্রাচীনকালে প্রাচ্যের দেশগুলোই লাভ করেছিল। বিদেশ প্রাচ্য থেকে আমদানী করেছিল খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর দিকে।

কস্তুরীকে পাওয়া যায় এক জাতীয় হরিণের নাভিদেশ থেকে। তাই ওকে মৃগনাভিও বলা হয়। এমনিতে খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীর দিকে ভুসুকুপাদ লিখেছিলেন "আপনা মাংসে হরিণা বৈরি।" হাঁ, হরিণ তার সুস্বাদু মাংসের জন্য সবার শত্রুতে পরিণত হয়েছে। আর এই হরিণকে শুধু মাংসের জন্য নয়, সুগন্ধির জন্যও মানুষ নির্মমভাবে হত্যা করতো।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভুসুকুপাদের কবিতার ঐ লাইনটুকু পরে বাংলার একটি বিখ্যাত প্রবচনে পরিণত হয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীর অসহায়া শ্রীরাধা নারী মাংস লোলুপদের দৃষ্টি এড়াতে না পেরে খেদের সঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন —

কি কৈলি কি কৈলি বিধি নিরমিয়া নারী।

আপনা মাংসে হরিণা বৈরি।

সত্যই বনের হরিণ সেই আদিকালে মানুষের জন্মলগ্ন থেকেই মানুষের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। চিরটাকাল নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে নারীও। জানি, বিজ্ঞানের প্রবন্ধে হরিণ শিকার, শ্রী রাধা, নারী ইত্যাদিদের টেনে আনা অবান্তর। তবু আনতে হল। হরিণ শিকার যে অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে — সেই তথ্য পরিবেশনের জন্য। আর সেই প্রাচীনকালেই এক বিশেষ জাতের হরিণের মধ্যে লাভ করেছিল কস্তুরী। কতদিন আগে — তা অবশ্য বলা যাবে না। প্রাচীন ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রগুলোতে কস্তুরীর উল্লেখ আছে। কোন কোন রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে

চিকিৎসকরা ব্যবহার করতেন। যদিও আজকের বিজ্ঞানীরা মনে করেন কস্তুরীর কোন ভেষজগুণ নেই।

সেকালে মানুষের সংখ্যা ছিল নিতান্তই কম। সারা ভারতে হয়ত পনের-বিশ কোটি। অরণ্য ছিল বহু বিস্তৃত। বিশেষ করে হিমালয়ের পাদদেশের অতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গহণ অরণ্য। কাশ্মীর থেকে অসম পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের আড়াই থেকে সাড়ে তিন হাজার ফুট উচ্চতায় ওরা ঘুরে বেড়াতো। চীন ও তিব্বতে এককালে ওদের সংখ্যা যথেষ্টই ছিল। জাতে হরিণ হলেও ঠিক ঠিক হরিণের মত নয়। বৈজ্ঞানিক নাম মোসচুস মোসাচিফেরাস। সাধারণ ইংরেজি নাম মাস্কডিয়ার। মাস্ক অর্থে কস্তুরী। আমরা বলি কস্তুরী মৃগ। বিভিন্ন দেশে ওদের নাম বিভিন্ন। উচ্চতায় খুব বেশি হয় না। পূর্ণবয়স্করা মাত্র দেড় ফুট থেকে দুই ফুট পর্যন্ত এবং ওজনে মাত্র কিলো দশেকের মত।

কস্তুরী মৃগরা যেমন নিরীহ, তেমনই ভীতু। বনের বাঘ থেকে ছোটখাটো সাধারণ একটা হিংস্র জন্তুও ওদের শত্রু। বড় শত্রু মানুষই। প্রথম থেকেই অব্যাহত রেখেছে ধ্বংসলীলা। কস্তুরী, মাংস এবং চামড়ার জন্য। ওদের চামড়াটাও ভারি মূল্যবান।

সাধারণ হরিণ থেকে অনেকখানি পৃথক এরা। শিং নেই, পেছনের পা দুটো সামনের পা-জোড়া থেকে লম্বা। কান দুটোও বেশ খাড়া ও লম্বাটে। রঙটা ধূসর বাদামী। বাবুরাম সাপুড়ের সেই সাপের মত হাবাগোবা হলেও পুরুষ হরিণদের ছেদক দন্ত মাড়ি থেকে নিচের দিকে ঝুলে থাকে। যদিও মেয়ে হরিণদের এমনভাবে দাঁত বেরিয়ে থাকে না। আর কস্তুরী জমে ঐ পুরুষ হরিণদের পেটের তলদেশে নাভিদেশের কাছাকাছি একটি গ্রন্থিতে।

হরিণ শিকারের মাধ্যমে ওরা কেমন করে যেন টের পেয়েছিল কস্তুরীর কথা। আশ্চর্যও লাগে। কেন না যে গ্রন্থিটিতে কস্তুরী থাকে সেই গ্রন্থিটি কাঁচা মাংসের মতই দেখতে। গন্ধও বিশেষ থাকে না। গ্রন্থিটিকে শুকিয়ে নিলেই ভুরভুর করে মিষ্টি গন্ধ ছড়ায়। যাকে বলা হয় কস্তুরী। একেবারে অতুলনীয় সুগন্ধি। পূর্ণবয়স্ক একটি পুরুষ হরিণের দেহ থেকে লাভ করা যায় মাত্র ৫০ গ্রামের মত কস্তুরী। ঐ টুকুর বাজারমূল্যও বড়কম নয়। ২৫০ ডলারের কাছাকাছি।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, কস্তুরী মৃগ এবং কস্তুরীর কথা অনেক আগে থেকেই ভারত, চীন প্রভৃতি প্রাচ্যের দেশ জানতো। সংগ্রহও করতো। পাশ্চাত্যের দেশগুলো কস্তুরী সম্বন্ধে আদৌ কিছু জানতো না। কথিত আছে, মার্কোপোলো প্রাচ্যের দেশগুলোতে ভ্রমণকালে কস্তুরীর সঙ্গে পরিচিত হন। এর গন্ধ মার্কোপোলোকে এমনভাবে আকৃষ্ট করেছিল যে, বেশ কিছু কস্তুরী তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। দীর্ঘকাল পরে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কস্তুরীর কথা প্রকাশ করেন। তার পর থেকে প্রাচ্য থেকে ঐ মূল্যবান সুগন্ধিটিকে সংগ্রহ করার প্রচেষ্টা চালায় পাশ্চাত্য।

বিদেশে চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হিমালয়ের কস্তুরী মৃগদের বিপদ আরও ঘনিয়ে

আসে। সে সময় বন্য পশু সংরক্ষণের ব্যাপারে কারও মাথাব্যথা ছিল না। হত্যালীলা চলতো এন্তারভাবে। পুরুষ, স্ত্রী, কেউ বাদ পড়তো না। কোনটা পুরুষ আর কোনটা স্ত্রী — সেটা দূর থেকে চেনাও সহজ ছিল না। শোনা যায় হিমালয় অঞ্চলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্তও ওরা সংখ্যায় যথেষ্ট ছিল। কারণ, ওরা অতি নিরীহ এবং দুর্বল হলেও আত্মরক্ষার নিয়মকানুন ভালভাবে রপ্ত করেছিল। থাকতো উঁচু অঞ্চলে — অনেকের নাগালের বাহিরে। দলবদ্ধভাবে বাস করতো না। পাগলের মত আপন মনে একা একাই নাভিদেশে কস্তুরীর পুঁটুলিটি নিয়ে ঘুরে বেড়াতো। দিনের বেলায় নয়, রাত্রিতে। মস, লাইকেন থেকে ঝোপঝাড়ের কচি কচি পাতা — যা পেতো তাই খেতো। যা চাইতো — অর্থাৎ নিরাপত্তা তারা পেত না। ভোরের অনেক আগে ফিরে আসতো নিরাপদ আশ্রয়ে। কিন্তু বনভূমি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় নিরাপত্তা পুরোপুরি বিঘ্নিত হলো। আশ্রয়হীন হয়ে পড়ায় এগিয়ে গেল অবলুপ্তির দিকে।

ওদের অনেক বৈশিষ্ট্য ছিল। হয়ত নিরাপত্তার কারণেই তারা যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করতো না। বাসস্থান থেকে দূরে-বহূদূরে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় সবাই প্রয়োজন বোধে একা একা আসতো এবং মলমূত্র ত্যাগ করে যেতো। সাধারণের শৌচাগারের মত। তাই তাদের বাসস্থানের হদিস পাওয়া বেশ কষ্টকর ছিল।

ওরা যখন অবলুপ্তির একেবারে শেষ পর্যায়ে তখনই আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। বিশ্বের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিভাগও বেশ তৎপর। তবু চোরা শিকারীদের ক্রুর দৃষ্টিকে ওরা উপেক্ষা করতে পারেনি। একেবারে বিরল একটি প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে। দু-দশটি এখানে ওখানে অভয়ারণ্যে টিকে আছে মাত্র। মা হরিণ একসঙ্গে মাত্র একটি, কখনও বা দুটি শাবক প্রসব করে। ওদের শিশুমৃত্যুর হারও যথেষ্ট। তাই বংশবৃদ্ধি আদৌ হচ্ছে না বলতে হবে। কস্তুরী-মৃগকে হত্যা না করেও অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে কস্তুরী সংগ্রহ করার পদ্ধদি আবিষ্কৃত হয়েছে। তবু লোভী শিকারীরা সুযোগ খোঁজে হত্যার জন্য।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, নানা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ঐ কস্তুরী-মৃগরা। সব বৈশিষ্ট্য আজও বিজ্ঞানীদের কাছে উন্মোচিত হয়নি। তাই এখনও যথেষ্ট গবেষণার অবকাশ রয়েছে! কিন্তু তার আগে হারিয়ে যেতে বসেছে সুন্দর এই প্রাণীটি। হারিয়ে যাওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ মানুষের কস্তুরীর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ। নানা দ্রব্যকে মিষ্ট গন্ধযুক্তক্ত করার বড় হাতিয়ার। রসায়ণ শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে, মানুষের বিলাসোপকরণ প্রস্তুতির প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, আর প্রাণ দিচ্ছে ঐ নিরীহ প্রাণীরা। রক্ষকেরাও কোথাও কোথাও ভক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করে।